সিসৃক্ষা

কলেজ পত্রিকা - ২০২৫

বাঁকুড়া জিলা সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যাপীঠ

বাঁকুড়া জিলা সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যাপীঠ

জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো।

কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।

–শ্রীশ্রী মা সারদা

বার্ষিক পত্রিকা : ২০২৫

Publisher :

Teacher-in-Charge
Bankura Zilla Saradamani Mahila Mahavidyapith,
Nutanchati, Bankura

Members of Magazine Committee :

- Dr. Amit Bairagi Convenor
- Dr. Uday Sankar Sarkar
- Dr Anupriya Mandal
- Dr Sayantan Mandal
- Dr Rituparna Chattopadhyay
- Dr. Buddhadeb Chatterjee
- Dr. Abira Dutta Roy
- Prof. Amit Sana
- Dr. Ananda Saini
- Dr. Priyanka Banerjee
- Prof. Dhananjoy Murmu
- Prof. Meghna Roy

Editorial Board :

Dr Amit Bairagi
Dr. Ananda Saini
Prof. Monoj Kr. Dey
Prof. Anindita Mukherjee
Prof. Swagata Pati

Assistance :

Dr. Anurupa Mukhopadhyay
Prof. Anabik Biswas
Dr. Haradhan Kundu
Dr. Amrita Majumdar
Prof. Jahangir Hossain
Prof. Tapas Sutradhar
Sri Mrityunjay Lakshman

Printed By :

Perfect Offset Printers
Schooldanga, Bankura
Pin-722101

শ্রদ্ধায় ও স্মরণে

আমাদের অনুভূতির কাছাকাছি, মনের কাছাকাছি, জীবনের কাছাকাছি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মহাপ্রয়াণে আমরা শোকাহত, তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি।

কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতির কলমে

আমার প্রাণের শহর বাঁকুড়া জেলার এক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মহাবিদ্যাপীঠ হল শ্রীশ্রীসারদা মায়ের নামাঙ্কিত 'বাঁকুড়া জিলা সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যাপীঠ'। ১৯৭৩ সালের ২৭শে আগষ্ট বাঁকুড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বর্গীয় শ্রী কাশীনাথ মিশ্র মহাশয়ের প্রচেষ্টায় তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে এই কলেজের যাত্রা শুরু হয়। আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত যে, গত ০৬.১১.২০২৪ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদনক্রমে আমি এই কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত হই। উচ্চশিক্ষার আঙিনায় আলোকপ্রাপ্ত ছাত্রীদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশে এই কলেজ রাজ্যস্তর ও জাতীয়স্তরে বিশেষ অবদান রেখেছে। সাম্প্রতিক এই কলেজের শিরোনামে ভারত বিভাগের ডাক টিকিট কলেজটিকে জাতীয় চরিত্রের রূপ দিয়েছে।

এই কলেজে চমৎকার একটি আশ্রমিক পরিবেশ বজায় আছে। বিগত বাহান্ন বছর পঠন-পাঠন, মূল্যায়ন এবং বিবিধ সহপাঠক্রমিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কলেজটি সফলভাবে তৃতীয় স্তরের ন্যাক সার্কেল অতিক্রম করে শিক্ষাবলয়ে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান পরিসংখ্যানে কলেজের প্রায় ৩১০০ ছাত্রী নিয়মিত পড়াশোনা করে। NEP 2020 কার্যকরী হওয়ার পর এখানে দুটি শাখায় চৌদ্দটি বিভাগে স্নাতক স্তরে পাঠদান করা হয় যথা- বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, ম্যাথেমেটিকস, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মিউজিক, এডুকেশন, সমাজতত্ত্ব ও ফিজিক্যাল এডুকেশন। পাঁচটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠদান করা হয় যথা- বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল, ইতিহাস, ও মিউজিক। এছাড়াও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠদানের কেন্দ্র হিসাবে দূরশিক্ষা বিভাগ গড়ে উঠেছে। ২২ জন পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ৪২ জন স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ৭ জন পূর্ণ সময়ের শিক্ষাকর্মী ও ৩৬ জন আংশিক সময়ের শিক্ষাকর্মী কলেজের উন্নতিতে অবিরাম কর্মরত। কলেজের সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীগণ সুষ্ঠুভাবে কলেজ পরিবেশের দায়বদ্ধতায় নিষ্ঠার সঙ্গে কর্মরত।

কলেজের সার্বিক প্রসার লক্ষ্য করে আমি পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসাবে যোগদানের পর একটি দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের প্রয়োজন অনুভব করি। সেই লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আনন্দের সাথে জানাই বর্তমান রাজ্য সরকার দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের স্থান অনুমোদন করেছে। এই কলেজের উন্নয়ন কল্পে বাঁকুড়ার সাংসদ, বিধায়ক তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থানুকূল্যে ভবন নির্মান, রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান প্রাপ্ত অনুদান ও বাঁকুড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী সকলের সহযোগিতা অনস্বীকার্য। যদিও যাত্রাপথের শেষ নেই, অনেক কাজ এখনো বাকি।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষিত বহুমুখী প্রকল্প, যেমন **স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, কন্যাশ্রী প্রকল্প, স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস্ স্কলারশিপ, মাইনরিটি স্কলারশিপ, চিফ মিনিস্টার স্কলারশিপ, ওয়েসিস স্কলারশিপ** এবং আরো নানাবিধ সুযোগ পাওয়ার ফলে এখন নারীশিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটেছে ও ঘটছে। আগামীদিনে কলেজের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে পরিচালন সমিতির সকল সদস্যমণ্ডলী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী এবং স্নেহের ছাত্রীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

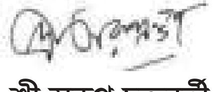

শ্রী অরূপ চক্রবর্তী

সভাপতি, কলেজ পরিচালন সমিতি ও সাংসদ, বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্র

অধ্যক্ষার (ভারপ্রাপ্তা) কলমে

" শিক্ষা মানবিক বিকাশের পথরেখা"

আদরণীয় সহকর্মী ও শিক্ষাকর্মী বৃন্দ, প্রিয় শিক্ষার্থী এবং সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ,আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই আপনাদের সবাইকে।

১৯৭৩ সালের ২৭ এ আগস্ট বাঁকুড়ার মহান ব্যক্তিত্ব ও সমাজসেবী স্বর্গীয় কাশীনাথ মিশ্র মহাশয় এর উদ্যোগে তদানীন্তন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের বদান্যতায় শ্রীশ্রী সারদা মায়ের নামাঙ্কিত এই কলেজের যাত্রা শুরু। গর্বের অর্ধশত বছর অতিক্রান্ত। ভারপ্রাপ্তা অধ্যক্ষা রূপে 01/02/2025 দায়িত্ব গ্রহণের পর নানান ক্ষেত্রে মহাবিদ্যাপীঠ পারদর্শিকতার নিদর্শন স্থাপন করেছে যা আমাকে সবিশেষ আপ্লুত করে।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও আমাদের কলেজের বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে—এটা আমাদের সবার কাছেই এক আনন্দঘন মুহূর্ত। এই পত্রিকা কেবল একটি প্রকাশনা নয়, এটি আমাদের কলেজের এক বছরের শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের জীবন্ত দলিল।

এই পত্রিকায় আমাদের শিক্ষার্থীরা যেমন তাঁদের সাহিত্যিক প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছে, তেমনি শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মীবৃন্দ এবং প্রাক্তনীরাও তাঁদের মূল্যবান চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন। এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা সবাই মিলে একটি সমৃদ্ধ মননের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই, যেখানে পাঠ্যক্রমের বাইরেও চিন্তা, সৃজন এবং উপলব্ধির জায়গা থাকবে।

আমাদের কলেজের শিক্ষার্থীরা শুধু একাডেমিক ক্ষেত্রেই নয়, সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যকলাপ, যেমন বিতর্ক, নাটক, সংগীত, ক্রীড়া এবং সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডেও প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বিশেষত বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ইন্টার কলেজ ভলিবল প্রতিযোগিতায় পরপর তিনবার চ্যাম্পিয়ন আমাদের মহাবিদ্যাপীঠ। আমি তাঁদের এই সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি তারা ভবিষ্যতেও নিজেদের উৎকর্ষের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। NSS ও NCC মহাবিদ্যাপীঠের গৌরব বৃদ্ধিতে সবিশেষ ভূমিকা রেখেছে। মহাবিদ্যাপীঠের নিজস্ব শরীরচর্চা কেন্দ্রে ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান গৌরবান্বিত করে। এছাড়াও সহপাঠক্রমিক নানান কাজে যেমন রাজধানী দিল্লিতে ও জেলা স্তরের সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকা আওয়াজেও কলেজের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে, স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির, থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা শিবির, কলেজের তিনটি জাতীয় সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে নিয়মিত বৃক্ষরোপণ, স্বচ্ছতা অভিযান গ্রামের শিশুদের পাঠদান, বিনামূল্যে চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ইত্যাদি মহৎ কাজে ছাত্রীদের নিয়ত নিয়োজন মহাবিদ্যাপীঠের গৌরব বৃদ্ধি করে।

এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের সৌজন্যেই এই প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের মূল লক্ষ্য হলো একটি সুস্থ, সৃজনশীল ও মূল্যবোধ-নির্ভর শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা, যেখানে আমাদের শিক্ষার্থীরা শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল করবে না, বরং একজন ভালো মানুষ হিসেবেও গড়ে উঠবে।

NEP 2020 কার্যকরী হওয়ার পর তিনটি শাখায় ১৪টি বিভাগে স্নাতক স্তরে পাঠ দান করা হয়। বর্তমানে সর্বমোট ছাত্রী সংখ্যা ৩১০০। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত ও পরিচালিত পাঁচটি যথা বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল,ও সংগীত বিভাগে নিয়মিত স্নাতকোত্তর পাঠদান দক্ষতার সাথে চলছে। এছাড়াও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর দূর শিক্ষা বিভাগের পাঠদানের কেন্দ্র হিসেবে বাঁকুড়া জেলায় সবিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছে। NAAC 3rd Cycle কৃতিত্বের সাথে অতিক্রম করে 4th Cycle এর দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। মহাবিদ্যাপীঠে ২৩জন পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা ৪২ জন

SACT টিচার।০৭জন পূর্ণ সময়ের শিক্ষা কর্মী ৩৬ জন আংশিক সময়ের শিক্ষা কর্মী কলেজের সার্বিক উন্নতিতে অবিরাম কর্মরত।

মহাবিদ্যাপীঠের সার্বিক উন্নয়নকল্পে কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি মাননীয় সাংসদ শ্রী অরূপ চক্রবর্তী মহাশয় এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সহায়তায় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের স্থান অনুমোদিত হয়েছে। মহাবিদ্যাপীঠের উন্নয়নকল্পে বাঁকুড়ার সাংসদ ,বিধায়ক তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ UGCর অর্থানুকূল্যে ভবন নির্মাণ,রাষ্ট্রীয় উচ্চ শিক্ষা অভিযান থেকে প্রাপ্ত অনুদান ও বাঁকুড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী বিভিন্ন কোম্পানির সহযোগিতা অনস্বীকার্য। উল্লেখ্য পি সি চন্দ্র গ্রুপ এই মহা বিদ্যাপীঠের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে মোট ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন যা গ্রন্থাগারের বৃদ্ধিকরণ,ওয়াটার হারভেস্টিং প্রজেক্ট, টয়লেট ব্লক ও ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। মহা বিদ্যাপীঠে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল লাইব্রেরী সঙ্গে e-shelf ও INFLIBENT এর সুবিধা আছে। গ্রন্থাগারে বর্তমানে বই ও জার্নালের সংখ্যা ২৬ হাজার অতিক্রান্ত। কলেজ প্রাঙ্গণের ভিতরেই 'মা সারদা' ও 'ভগিনী নিবেদিতা' নামক সমস্ত আধুনিক সুবিধা সহ দুটি পৃথক ছাত্রী নিবাস রয়েছে। সম্প্রতি সরকারি অর্থানুকূল্যে WBREDA-র পরিচালনায় কলেজের প্রশাসনিক ভবনের ছাদে সাড়ে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি 20 কেভি ক্ষমতা বিশিষ্ট সোলার প্রজেক্ট স্থাপিত হয়েছে।

বর্তমান রাজ্য সরকারের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষিত বহুমুখী প্রকল্প যেমন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, কন্যাশ্রী প্রকল্প ,স্বামী বিবেকানন্দ মেরিটকাম মিন্স স্কলারশিপ,চিফ মিনিস্টার স্কলারশিপ ,ওয়েসিস স্কলারশিপ,মহাবিদ্যাপীঠের পক্ষে বিভিন্ন ঘোষিত পুরস্কার হোস্টেল ও ভর্তি সংক্রান্ত ফি মুকুব নানান সুযোগ সুবিধা প্রদানের ফলে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে কেবল জেলা নয় সমগ্র রাজ্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। মহাবিদ্যাপীঠের নামে ভারতীয় ডাক বিভাগের পক্ষ হতে খাম প্রকাশিত হয়েছে যা মহাবিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুটে আরো একটি পালক সংযোজিত হল।

শিক্ষা শুধু ডিগ্রির সার্টিফিকেট নয়, শিক্ষা মানবিক বিকাশের পথরেখা।আজকের এই প্রতিযোগিতামূলক সমাজে অনেকেই মনে করেন, শিক্ষা মানে কেবল পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া, উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করা এবং একটি চাকরি পাওয়া। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষা তার চেয়ে অনেক গভীর ও বিস্তৃত একটি বিষয়। শিক্ষা শুধু ডিগ্রির সার্টিফিকেট নয়; শিক্ষা মানুষের মানসিক, নৈতিক ও মানবিক বিকাশের পথরেখা।

আমাদের সমাজে আজ যেসব সমস্যা দেখা যাচ্ছে—সহিংসতা, দুর্নীতি, অসহিষ্ণুতা, ধর্মীয় মেরুকরণ, নারীত্বের অসম্মান—তার মূল কারণ অনেকাংশে মূল্যবোধ-ভিত্তিক শিক্ষার অভাব। শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত হওয়া যথেষ্ট নয়, যদি সেই জ্ঞান মানুষের মধ্যে মানবতা,সহানুভূতি ও সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি না করে।

শিক্ষা তখনই সার্থক, যখন তা ব্যক্তিজীবনে ও সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। একজন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ তার জ্ঞান, আচরণ, শিষ্টাচার, চিন্তা ও কাজে শিক্ষার প্রতিফলন ঘটান। তার মধ্যে বিনয়, সহানুভূতি, সহনশীলতা এবং দায়িত্ববোধ থাকে। আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন: "Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think." এই চিন্তাই শিক্ষা ও ডিগ্রির পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তোলে।

পরিশেষে আমি পত্রিকার সবিশেষ সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা কামনা করি। আগামী দিনে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হবে এই আশা রাখি। শ্রী শ্রী মা সারদার চরণে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করি। শ্রী শ্রী মায়ের আশীর্বাদে পূর্ণ হয়ে উঠুক সবার জীবন।

ড. অনুরূপা মুখোপাধ্যায়, ভারপ্রাপ্তা অধ্যক্ষা
বাঁকুড়া জিলা সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যাপীঠ

সূচীপত্র

গোধূলি লগন	মুদ্রা পাত্র	11
শেষ পর্যায়	পৌলমী দাস	12
নির্যাতন	রিয়া সেন	13
অবহেলা	সুস্মিতা দাস	13
Need & Westwind Again?	Sanchita Patra	14
College Life	Moumita Patra	15
আমাদের জগজ্জননী সারদামণি	পায়েল পাত্র	16
চাঁদ	সম্পা বাগ্‌দী	16
অভয়া	শেলী কুমার	17
বদ অভ্যাস	মাহেসা খাতুন	18
তালাক	আসিক খান	19
প্রোপাগান্ডা	আসিক খান	19
ভাগচাষী	আসিক খান	20
রূপকথার গল্প	আসিক খান	21
রিলেটিভিটি	আসিক খান	21
চাকরীর মাঝে	আসিক খান	22
মেয়ের পিতা	শেলী কুমার	23
দোষ	চম্পারাণী বাগদী	24
হারানো স্মৃতি	চম্পারাণী বাগদী	24
মহাজাগতিক জিজ্ঞাসা	ডঃ অনুরুপা মুখোপাধ্যায়	25
সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত দুই প্রত্নলেখ'র আলোকে দুই ভিন্ন ঐতিহাসিত প্রেক্ষিত	ঋতুপর্ণ চট্টোপাধ্যায়	26
বিপন্ন শৈশব ও টেলি প্রজন্ম	মুন্নালাল টিকাইত	28
সলিল চৌধুরী : আমার অনুভবে	হেমন্ত পাল	31
Transformation of Tribal community of South West Bengal	Dr. Uday Sankar Sarkar	34

Learning Physical Geography through Filmy Lens	Dr. Abira Dutta Roy	38
Mona Lisa Smile and Little Women : Cinema of Choice, Change, and Quiet Courage	Meghna Roy	43
বর্তমান যুগ-সমাজে আধ্যাত্মিকতার প্রাসঙ্গিকতা	ডঃ শিল্পী বক্সী	46
স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সংস্কৃত ভাষা ও তার প্রাসঙ্গিকতা	অমিত সানা	51
ভূগোল : বর্তমান প্রয়োগ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	জাহাঙ্গীর হোসেন	54
''বাংলা ভাষার উৎস সন্ধানে'' - একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা	ড. ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়	56
উচ্চশিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)	মৃত্যুঞ্জয় লোক্ষণ	60
দীঘা ভ্রমণ	অন্তরা রায়	62
ব্যর্থ সোহাগ	মুদ্রা পাত্র	64
ভট্টিকাব্যে শরৎ ঋতুর সৌন্দর্য্য	পায়েল পাত্র	68
অন্তরালে	এষা বরাট	70
আমার কলেজ জীবনে প্রথম পুরীভ্রমণের অভিজ্ঞতা	পায়েল পাত্র	72
Women Empowerment through Education at Saradamani Mahila Mahavidyapith	Purbali kundu	74
THE OCEAN'S LESSON	Susmita Dutta	76

গোধূলি লগন

মুদ্রা পাত্র
বাংলা বিভাগ (২য় সেমিস্টার)

এক মনোরম পরিশ্রান্ত গোধূলি লগনে আমি দেখেছিলাম এক নারীকে,
রৌদ্রের উজ্জ্বলতা আর শশাঙ্কের শীতলতা যেন ফুটেউঠেছিল তার কেশরাশিতে।
তার সেই ঢেউ খেলানো চুলে সে মেখেছিলো চন্দন গাছের আতর ,
সেই গন্ধে বিভোর হয়ে আমি যেন হয়ে উঠলাম এক দুরন্ত প্রেমকাতর।
বসন্তের অস্তরাগে এক অভিমান জাগিল তাহার মনে,
মেলল সে তার তৃষিত আঁখি মোর অস্থির মুখপানে।
ওই মায়ায় ভরা চাওনিতে সেদিন বোধহয় জেগেছিল পূর্ণিমার আলো ,
যা আমার অন্তরে থাকা সব দুঃখ - ক্লেশকে নিমেষে মুছে দিল।
আরেকদিন দেখেছিলেম তারে ওই পদ্মানদীর পারে,
উজাড় করিলাম মোর নবযৌবন ওই ছায়াসঙ্গীনিটির তরে।
পুলকিত হলো মোর অন্তরে অন্তরে তার ওই আঁধার ঘোচানো হাসি,
সে হাসির ঝনক ঝঙ্কারে তিমির বক্ষ মেতে উঠিল বাজায়ে মধুর বাঁশি।
আমার হৃদয় সাগর উচ্ছলিতে কেন বাজাও তব কিঙ্কিনি?
সুধা পরশে, প্রেম হরষে মোর স্বপ্নে কেন বিচরিছ তুমি একাকিনী!
অপরূপে আঁকা মুখশ্রী তব দিগন্তে উঠেছে জাগি!
জুঁই - শেফালীর পুষ্প ডালা এবার সাজাবো যে তাহার লাগি।
আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তব আনন্দ গান গাহিব,
ধ্রুবতারার ওই শীতল আলোকে আমি তাহার পরান দেখিব।
তাহার স্নিগ্ধ ললাট আঁকিব আমি শ্বেত চন্দন তিলকে,
বেদনায় ভরা এই হিয়ার স্পন্দনকে আমি জাগাবো মাধুরী মুকুলে।
ওই প্রিয়দর্শিনী বিরহিনীর কথা কি আর আমি রচিব?
নাকি সেই চিররক্তিম স্মৃতিকে জড়িয়ে চিরকাল তাকে পূজিব!

শেষ পর্যায়

পৌলমী দাস
কেমিষ্ট্রি বিভাগ (ষষ্ঠ সেমিষ্টার)

আর মাত্র এক-দু মাস
শেষ হতে চলেছে
আবারও একটি অধ্যায়
কত স্মৃতি, কত আড্ডা ,কত ঝগড়ার পর্যায়

দিয়ে গেল অনেক কিছু
আবার কেড়েও নিল অনেক কিছু
এই তিনটি বছরের স্মৃতি আজীবন চলবে
আমাদের পিছু পিছু
যা শিখিয়ে দিল অনেক কিছু।

কিছু বন্ধু দিল আবার কিছু কেড়েও নিল
হয়তো সবকিছুর ছিল কারণ
যেগুলি সাধারণ মানুষের বোঝা ছিল বারণ।
কিন্তু সবকিছুই থাকবে স্মৃতির অগোচরে গোছানো
মনের মণিকোঠায়।

মনে পড়বে শহরটা প্রচন্ডভাবে
হয়তো আসা হবে ফিরে
কিন্তু হবেনা পাওয়া সেই মানুষগুলোকে কোনোভাবেই।

দেখতে দেখতে ৩ টে বছর কাটালাম
আবার ফেলে যাওয়ার জন্য তৈরিও হলাম....
ফেলে যাবো আবারও.....

ফিরে দেখা কিছু স্মৃতি
থাকবে চিরকাল
যেগুলি টানবে আমাদের বারবার
হয়তো তাই ফিরে আসতে চাইবে মন আবারও
আমার প্রাণের শহর বাঁকুড়ায়
আমার প্রাণের শহর বাঁকুড়ায়
আমার প্রাণের শহর বাঁকুড়ায় ....।।।।
ফিরে দেখা

এই জীবনে অনেক মানুষের সাথে আলাপ হয়
কিন্তু তাদের মধ্যে কিছুজনের সাথে
আলাপ হয় খুব অল্প সময়ের জন্য
যারা থেকে যায় মনে আজীবন।

ভোলা অসম্ভব হয় তাদের
হয়তো সম্ভব না হওয়ায় ভালো।

একের পর এক শহর পাল্টে যায়
কিন্তু থেকে যায় মানুষগুলো।

শহরের অলিগলি ডাকবে আবার
বলবে ফিরে আয় বারবার
চায়ের আড্ডা,রাত জেগে গল্প,
ঘুরতে যাওয়া, কলেজের স্মৃতি
উঁকি মারবে আর দিয়ে যাবে
চোখের কোণে একরাশ জল ।

অনেক সুন্দর স্মৃতি দিয়েছে শহরটা
হয়তো ফিরিয়ে দিতে পারিনি কিছু
কিন্তু ভুলবনা কখনো তাদের
এই শহর আমাকে উপহার দিয়েছে যাদের....

অনেক সুন্দর অনুভূতি আর
অনেক ভার নিয়ে চলে যেতে হবে
দেখা হবেনা তাদের সাথে হয়তো
যাদের সাথে এখন সারাটা দিন কেটে যায় অফুরন্ত।

পুরোনো কিছু ফেলে
নতুনের দিকে এগনোই যে নিয়ম
যা আমাদের মানতে হবে জীবন।

সবকিছু মিস করবো খুব
আর মনকে বলবো
আবার ফিরে আসবো
আবার ফিরে আসবো
আবার ফিরে আসবো....।।।।

নির্যাতন

রিয়া সেন
পদার্থবিদ্যা বিভাগ (চতুর্থ সেমিস্টার)

বিশ্বজুড়ে আজ হাহাকার!
যুবতী, আর বৃদ্ধার স্বরে উঠেছে চিৎকার;
ফুলের মতো ফুটফুটে শিশু
পেলো না আজ রক্ষা
ওই নরপিশাচের থেকে
জীবন দিল না ভিক্ষা

যেন আঁধার ঘনিয়ে এসেছে ধরিত্রীবক্ষে I
মায়েদের ইজ্জত বড়োই ঠুনকো আজ
মাতৃ যোনির নেশায় মেতেছে
ধর্ষকের দল,
তাদের হিংস্র কামুক চোখ থেকে
পার পায় না নির্বোধ, অবুঝ পশুরাও!
আর প্রশাসন??
সবই তো রাজনীতির ধোঁয়ায় অপরিচ্ছন্ন ।
সে রাজনীতি, কী অবলীলায়
মুছে দিতে চায় মাতৃ যোনির রক্ত!
কিন্তু ক্ষত??
মুছতে কি পারে
অঝোর সেই অশ্রুধারা??
খালি হয়ে যায় কত মায়ের কোল,
হে ধর্ষিতা মাতা!!
কেন জন্মেছিলে এ অভিশপ্ত দুনিয়ায়?
ধিক্কার জানাই সমাজকে,
ধিক্কার জানাই জাতির ধার্মিকতাকে।।

অবহেলা

সুস্মিতা দাস
ইংরেজি বিভাগ (প্রথম বর্ষ)

ছেলেবেলায় কষ্ট সহ্য করে বড়ো করে যে মা,
বড়ো হয়ে সেই মাকে অনেকেই দেখে না।
নিজে না খেয়ে সন্তান-সন্ততিদের খাওয়াই যে মা
বড়ো হয়ে সেই সন্তানেরা মাকে সম্মান দেয় না।
জীবন যুদ্ধের উঠাপড়াতে মা সবসময় পাশে থাকে
আসন্ন কালে অনেক মায়ের কপালে অবহেলা থাকে।
সারাদিনের পরিশ্রমে মা খুব ক্লান্ত হয়,
শেষ জীবনে কেন বহু মা বৃদ্ধাশ্রমে যায়?
নায়ক, শিল্পী, ব্যবসায়ী এবং উচ্চপদস্থ ডাক্তার,
নিজের সুখের জন্য অনেক ক্ষেত্রে করে মাকে পরিহার।
শেষ বয়সে অনেক মায়ের কপালে জোটে অবহেলা,
যারা এ কাজ করে, তাদের সাথেও যেন হয় এই নিষ্ঠুর খেলা।।

Need & Westwind Again?

Sanchita Patra
English Department (6th Semister)

Need a Westwind again?
As the downfall has begin.

Like a whirlwind take us so high
That we forget to sign.

The girl is still weeping for justice in the corner
Don't let her be only a silent mourner.

Now, once again lift your voice over the river and hill,
For your clarion once moved thousands to will.

This air was clam and the rivers clear,
Until horror broke the morning's sphere

Their cries horrified the gentle breeze
Then silence covered the wounded trees

Where once the blocks in place had strayed
Now only blood and shadows coldly stayed.

Will the war start again?
A massacre will begin?

Blow, win, break the silence with your word
Let my pen be the sword.

Make me your lyre, even as shelley prayed
Through me let voices long ignored be made.

Be the trumpet of youth's voices ?????? cause
O wind, if spring is near, the break these laws.

College Life

Moumita Patra
English Department (PG. 2nd Semister)

Those buzzing halls, the morning rush,
The sleepy eyes, the coffee crush.
Laughter spilled in every lane,
Sunshine mixed with sudden rain.

The chalkboard talks, the backbench tales,
Dreams that rode on paper sails.
Late-night cramming, hopes held tight,
Parties stretching into hight.

Bunked classes, secret feelings,
Scribbled notes, and borrowed rings.
Fests and fights, those carefree cheers,
Moments stitched in golden years.

Now we walk different ways,
But heart still hum those college days.
In every smile, in distant skies –
college lives, it never dies.

আমাদের জগজ্জননী সারদামণি

পায়েল পাত্র
সংস্কৃত বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার

আমাদের জগতের মা সারদামণি ।
তুমিই আমাদের দুই নয়নের মণি ।।
আমাদের প্রাণের শহর বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটীর সেই ছোট্ট গ্রাম কামারপুকুরের মেয়ে ।
আমরা তোমার কত কত মেয়ে মিলে সেখানে দেখেছিলাম তোমার ওই কামারপুকুর গ্রামেতে গিয়ে ।।
তোমার নিয়ে কারোর মনে হয় না কোনো নিন্দুককথা ।
তোমার বলে যাওয়া সব অমরবাণী, আমাদের কাছে সর্বত্রই অমৃতকথা ।।
মা গো তোমার আশীর্বাদ ছাড়া হয় না কোনো কাজের শুভক্ষণ ।
তাই তো আমরা তোমার নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানে তোমার চরণদুটি পায়ে প্রণাম করি সর্বক্ষণ ।।
মা গো তুমি এই জগৎসংসারে প্রত্যেক জন্ম দেওয়া মায়েদের পরেই যে রয়েছো ।
তুমিই এই গোটা জগৎসংসারটাকে আপন করে নিতে শিখিয়েছো ॥
মা গো তোমাকে কে বলেছে যে তোমার কোনো সন্তান নেই ?
তোমার ঠাকুর তো তোমাকে মরে যাওয়ার আগেই বলে গিয়েছিলেন যে তোমার এই জগতে জন্মানো সমস্ত সন্তান তোমার জন্যই !
মা গো তোমার সন্তানদের মনভরে আশীর্বাদ দাও ।
তুমি ছাড়া যে এই ক্ষয়ে যাওয়া জীবন কাহিনী অতিবৃথা, তোমার সন্তানদের গ্রহণ করে নাও ॥
মা গো তুমি তো স্থাবর-জঙ্গমেরও মা ।
তুমি তো আমাদের মোদের সবার মা ॥
আমাদের জগতের মা সারদামণি ।
তুমিই আমাদের দুই নয়নের মণি ॥

চাঁদ

সম্পা বাগদী
ইংরাজী বিভাগ (২য় সেমিস্টার)

চাঁদ সম্পর্কে জানতে হলে পড়তে হবে
ভূগোল।
চাঁদের আকৃতি কখনো অর্ধেক তো কখনো
গোল।
চাঁদ দূর করে রাতের
কালো।
কিন্তু আশ্চর্য্য হল চাঁদের নেই কোনো
আলো।
চাঁদের গায়ে দেখা যায়
কলঙ্ক।
চাঁদের আশেপাশে তারা থাকে
অসংখ্য।

অভয়া

শেলী কুমার
এডুকেশন অনার্স, চতুর্থ সেমিষ্টার

যে মেয়েটি হাঁটতে শিখলো
মায়ের হাত ধরে
বাবা তার ছেড়ে এলো
গর্ব করে মেডিক্যাল-এ
প্রেমে-মমতায়;
আদরে-ভালবাসায়,
হচ্ছিল বড় নিজ সাহসিকতা ও কর্ম-দক্ষতায়
বুক ভরা গর্ব ছিল,
আমি স্বাধীন, আমি ভারতবাসী..
তবু কেন এ অনায়-অত্যাচার
কেন নেই কোনো প্রতিবাদ।
চক্ষু ভেজা লাল রক্ত;
হিংস্রতার কামড়ে দেহাবৃত।
সহস্র শয়তান এনেছে বান,
হৃদয় সরোবরে খুশির বন্যা প্রবাহিত যার।
বঙ্গ সভার রাজপথে;;
আজ কেন মিছিল?
যোদ্ধারূপী নারীগণ
আজ কেন দলে লরির?
গর্ব করো মানবজাতি তোমাদের সৃষ্টির প্রতীক নারী জাতি।

বদ অভ্যাস

মাহেমা খাতুন
ভূগোল বিভাগ (চতুর্থ সেমিস্টার)

হতে চাও চাঁদের মত? তাতে দাগ তো থাকবেই,
হতে চাও ফুলের মত? মৌমাছি বসবেই তো।
হতে চাও নদীর মত? তাতে বাঁক তো থাকবেই।
হতে চাও পাতার মতো? ঠিক সময়ে ঝরবেই তো।

হও যদি গাছের মতো! দাও যদি ছায়া।
খাবারের জোগান দাও, করে যদি মায়া।
তাতে কি? প্রয়োজনে তোমার কেটে ফেলবেই তো।

হও যদি জলের মত! করো জীবন দান
সর্বদিনের সর্বকাজে দাও না যতই যোগান।
অগ্রাহ্য করে নোংরা ফেলে তোমায় বিষাক্ত করবেই তো।

হও যদি নিজের মতো! আপন সাজে সেজে।
নিজ স্বার্থ, নিজ বিশ্বাস, নিজ মনোবল তেজে।
চর্চা করা কাজ টা যাদের, তারা করবেই তো।

তালাক

আসিক খাঁন
সরকারী আধিকারীক
বিকাশভবন

একই ছাদের তলায়
আলাদা দু দুটো মন
প্রানের পুরুষ বলার
অপেক্ষায় সারাক্ষন
ভালোবাসা কিভাবে
বাটোয়ারা হয় পড়ে
স্বামী একান্ত আপন
তালাক জ্যান্ত মারে
নতুন বিবির আবেগ
অথচ বাসনার কাম
তজবী গোনে সবাই
পুরাতনের মুছে নাম
তবুও কিভাবে শাদি
একে বেশি জায়েজ
বোরখা নীচে অধীন
জান্নাতে টুপি ফেজ

প্রোপাগান্ডা

আসিক খাঁন
সরকারী আধিকারীক
বিকাশভবন

প্রোপাগান্ডা মাথা তোলে,
ব্লু হোয়েল খেলায় ফেঁদে।
মস্তিষ্কর বিকৃতির খোলে,
মোমো অনলাইনে কেঁদে।
ফেসবুক হোয়াটস্অ্যাপে,
ভুয়ো নিউজের কারখানা।
দাঙ্গা রুখতে ছোটে র‍্যাফ,
পুড়ে ছাই যায় ধর্মে মানা।
ক্রিপ্টকারেন্সি ডার্কনেটে,
অনস্পটে অ্যাসাশিনেশন।
জুয়া খেলায় কোটি বেটে,
রোবটিক্স এ.আই প্যাশন।
সুইচ টিপে চালু মিসাইল,
ল্যাবে ম্যানমেড ভাইরাস।
পুঁজিবাদে বলে মাসকিল,
বায়োকেমিস্ট্রির সর্বনাশ।

চারদিক জন বিস্ফোরণ,
বাস্তব দুই চোখে ঝাপসা।
মানসিক রোগী প্রতিজন,
নেটে আজ মারন ব্যবসা।
মৃত্যু মিছিলে সমাজতন্ত্র,
সভ্যতা নাকি ধ্বংসে স্বত্ত।
শৈশব বুদ্ধিহীনে কলযন্ত্র,
ঋণাত্বক ডারউইনে তত্ত্ব।
মানবতা স্লোগান ভোমরা,
নতুনে প্রজন্ম ভাববে কি।
সৃষ্টির মৃত্যু জয়ী ডোমরা,
ভরসা তাহলে ইলুমিনতি।
উত্তরসুরি কি দেবে ঈশ্বর,
কল্কি হোক না ত মৈত্রেয়।
আত্মা যদি না অবিনশ্বর,
স্রষ্টা সৃষ্টির হতে তবু শ্রেয়।

ভাগচাষী

আসিক খান
সরকারী আধিকারীক
বিকাশভবন

এক টুকরো জমির ওপর মাটি বাঁধা ঘর,
মাঝে মধ্যে থাকে এসে মেয়ে দুটোর বর।
মাটির ছেলে আমি এক গরীব ভাগচাষী,
ফসল আর জমিরে তাই বড্ড ভালবাসি।
লাঙ্গল কাঁধে হাঁটার পথে সঙ্গী হয় ছেলে,
একবেলা তবু খেতে পেত স্কুল সে গেলে।
খেটে দিন ভর ক্ষেতে দেয় না শরীর সায়,
শহরে মেদ ঝরাতে জিমে নাকি সব যায়।
দুপুর রোদ তেষ্টা মেটানো ভরা ঘটি জল,
দুক্রোশ দূর বসানো গ্রামে একখানি কল।
কৃষকের হিতে কত স্কিম বছরে করে বার,
চড়া দামে বিক্রি তাও উন্নত বীজ ও সার।
প্রকৃতি রেগে গেলেই বন্যা খরার প্রকোপ,
পাখির থেকে বাঁচায় কাক তারুয়ার টোপ।
ভিটে যখন পা পড়ল তুলসী তলায় বাতি,
বিদ্যুৎহীন ঘরে তাই বাতাস জুড়ায় ছাতি।
রাতের বেলায় আবার এক সেদ্ধ চড়চড়ি,
শ্যালীর বিয়ে সামনে দিতে হবে হাত ঘড়ি।
ভোর হলে ঝাঁকা মাথায় চলি হাটের দিকে,
ভ্যান ভাড়ার কথা ভেবে দূরত্ব যেন ফিকে।
বাবুরা সব অঙ্ক কষে ভালো করে দরদাম,
মলেতে ফিক্সড প্রাইস দামী ব্র্যান্ডের নাম।
অল্প লাভ হয় যেটুকু ফুরায় করে বাজার,
ফিরলে ঘরে বৌ শোনায় ফিরিস্তি হাজার।
খবরে শুনি দেশে কোটি টাকা কেলেঙ্কারি,
চাষীর ট্যাক্স মকুব হলে মন্ত্রীর রাগ ভারী।
ব্যাংকে গেলে পড়ে বোঝায় লোনের নীতি,
শুধাতে না পারলে ভিটে হারানোর ভীতি।
লক্ষ কোটি কতো ঠগী নিত্ত নৈমিত্তি মারে,
কৃষক টলমলে চলে ঋণের দায়ের ভারে।
বেলা শেষে মুক্তির পথ দেখে সে অগত্যা,
সভ্যসমাজ নাম দিয়েছে যারে আত্মহত্যা।

রূপকথার গল্প

আসিক খাঁন
সরকারী আধিকারীক
বিকাশভবন

রাজকন্যার রাজ্যে
ঘোড়ায় চড়ে আগমন,
শত্রু প্রদেশের বীর শেহজাদা।
নৈরাজ্য, সেনাপতি অত্যাচারী;
অকর্মন্য শাসক
নারীর লাজ হরণ,
ঠগ জোচ্চর ভরে সেথা ভারী।
চাইতে যদি প্রজা আসে বিচার;
গর্দান সে হারায়
কান্না দেখেও কঠিন,
রাজকন্যা দেখে পা বেড়ি তার।
এমন এ রাজ্য কূটনীতিকে ভর;
ভিক্ষা চায় মা
শূন্য কোষাগার,
যুদ্ধ হবে সৈন্যরা কাঁপে থরথর।
এমত দুরবস্থায় দম্ভ কিছু কমেনা;
বংশীধারি শিশু
সুরের বাঁধন শুণে,
কেড়ে নিল বাঁশি তবু কৃষ্ণ দমেনা।
বংশীধারি কৃষ্ণ, রাজা কি জানত;
না বুঝে দমিয়ে
অভিশাপ কুড়লো,
মুছে দিয়ে রাজপাট তবেই ক্ষান্ত।
যুদ্ধ শেষে শেহজাদা প্রেমে পড়ল;
নতুন দ্বীপ খুঁজে
বঞ্চিত রাজ্য থেকে,
তবু সেই রাজকন্যার হাত ধরলো।
কৃষ্ণ তার বাঁশি ফেরত চেয়ে নিল;
বেরিয়ে রাস্তায়
সুর বাঁধা ফের শুরু,
প্রেমের কাছে ঈর্ষা অসহায় ছিল।

রিলেটিভিটি

আসিক খাঁন
সরকারী আধিকারীক
বিকাশভবন

ঝড় বৃষ্টি তুফান যোগ,
প্রকৃতির অভিশাপ!
কর্মফল রূপে দুর্যোগ,
মনে পড়ে সব পাপ।
নাকি সবটাই বেনামে
একত্র করার চেষ্টা,
মক্কা মদিনা চারধামে,
মনুষ্য তৈরী প্রচেষ্টা।
ধর্মের যত সংখ্যা বৃদ্ধি,
বানানো নতুন নীতি।
সবই মেনে নেয় সিদ্ধি,
কূটনীতিকের ভীতি।
চতুর্থ ক-অর্ডিনেট ঘর,
বোসন কনাই ঈশ্বর।
E সমানে mc স্কোয়ার,
স্রষ্টা ভাগ অবিনশ্বর!

চাকরীর মাঝে

আসিক খান
সরকারী আধিকারীক
বিকাশভবন

আমি এখন অনেক দূর থাকি,
হলোই বা অফিস এক!
চায়ের ভাঁড় সব জমিয়ে রাখি,
ফাইল শূন্য পড়ে র্যাক।
একা যখন বাসের ছুটি পিছন,
ভাবি জীবন চলে যাক!
ভাতের ফ্যান মরে শক্ত ভীষন,
স্কুটিটা তবু পড়েই থাক।
লিফট আজ কেনো এত ভীড়?
জানতে চায়না মন আর!
স্পর্শ লাগলেও করে চিড়বিড়,
একা খোঁজে রিসেপ্টার।

পাখা আজ ঘুরছে কত জোর,
উড়ছে না তবু নোটশীট।
কার্ডরিজটা নিয়ে গেছে তোর,
নিউ ডেস্কে করবে ফিট।
লাঞ্চ পার হলেও পড়েই রুটি!
ভিজে গেল কেন সন্দেশ?
গাজর,মুড়ি আর কড়াইশুটি।;
ফ্ল্যাটে উঠলি, ছেড়ে মেস।
বড়বাবু চেঁচিয়ে উঠলো হঠাৎ,
ডেকেছেন নতুন আমলা।
মিস খোদাই করা নামের পাত!
সমাপ্ত ডিভোর্সের মামলা।

মেয়ের পিতা

শেলী কুমার
এডুকেশন অনার্স (চতুর্থ সেমিস্টার)

চার চার জন মেয়ে আমার;
ঘরে নেইকো ছেলে,
ছেলের আসায় বউ আমার,
করেছে ধারণ গর্ভ আবার।
এবার যদি না হয় ছেলে;
গিয়ে দক্ষিণেশ্বরে করবো বিয়ে।
মেয়েদের আমার পাত্র চাই;
চার চার জন মেয়ে শুনে,
আসে না পাত্র আমার ঘরে।

ছোট মেয়ে স্কুলে যায় ,
পড়ে অ-আ-ক-খ।
বড় মেয়ে ডাক্তার;
বিলেতে পড়ে, করে সেবা গ্রাম।
মেজো মেয়ের শিক্ষকতা;
করার বড় আশা,
কিন্তু হবে কি করে?
পশ্চিমবঙ্গের যা দুর্দশা।
কলেজে পড়ে সেজো মেয়ে;
পাত্র চাইছি তারই।
তার বেলা তেও একই কথা,
জন মুখে-মুখে।
দিদিদের তার বিয়ে হয়নি,
চার চার জন বোন আছে বলে।
পাত্র এর থেকেও,
তার মা বাপের বড় আশা,
হতাশ হয়ে তারা বলে;
ছেলের আমার থাকবে না শালা
দেখে যখন ছেলে;
রূপবতী গুনবতী মেয়ে;
তারও মন আর পাঁচজনের মত
ছেলের মাসি বড়ই পাজি.
সে বলে;
বাছা এমন মেয়ে করিস নে তুই বিয়ে.
তোর পোলারা মামা কইবে কারে।
কেউ বা বলে;
বেশি শিক্ষিত হলে পরে,
মেয়েরা কম কথা শোনে।
শাশুড়ি বৌমার ঝামেলাতে,
বউয়েরা মুখ বেশি করে।
এমন মেয়ে করবি বিয়ে,
সে যেন চুপটি করে থাকে।

এত গেল সবার কথা....
তুমিও একবার ভাবো,
যাকে তুমি করবে বিয়ে,
সে কি আছে বসে শিব-কৃষ্ণের বরদান পেয়ে।
কে গেছে বলে;
তার গর্ভে শুধু পুত্র সন্তান হবে।
তোমার যদি না হয় ছেলে;
তোমার ছোট মানসিকতা-
তোমায় দত্তক নিতেও না দেবে।
তোমার মেয়ের বিয়েতেও.
শুনবে তুমি একই কথা লোকের মুখে,
নেই কো ছেলে তোমার ঘরে।
তোমার নাতি-নাতনি হলে;
বলবে মামা কাহারে।
তোমারও সেদিন মাথার উপর,
পড়বে ভেঙ্গে আকাশ.
যেদিন তোমার না জানা প্রশ্নের
থাকবে না কোন দেবার জবাব।

দোষ

চম্পারাণী বাগদী
অফিস পিওন

চোখের কি দোষ বল
    দেখতে চাই তোমাকে
দৃষ্টির কি দোষ বল
    ভালো লাগে তোমাকে।
ভগবানের কি দোষ বল
    বানিয়েছে তোমাকে
হৃদয়ের কি দোষ বল
    সুন্দর লাগে তোমাকে
আমার কি দোষ বল
    ভালোবাসি তোমাকে।

হারানো স্মৃতি

চম্পারাণী বাগদী
অফিস পিওন

সেদিনের কথা আজও মনে পড়ে
    হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি।
বার বার ফিরে আসে
    স্বপ্ন দেখার মতো।
এলো মেলো করে দেয়
    ভাবনা গুলো সব
ঝেড়ে ফেলে মন
    ততটা সহজ হতে
দেয় নি অতীত।

মহাজাগতিক জিজ্ঞাসা

ডঃ অনুরূপা মুখোপাধ্যায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
বাঁকুড়া জিলা সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যাপীঠ

নীরব রাতের নীলে ভাসে, অগণিত তারা দীপ্ত,
জিজ্ঞাসা জাগে হৃদয়ে: কে আঁকলো এই চিত্রপট?
কে গড়লো সূর্য-চন্দ্র, কে বাঁধলো গ্যালাক্সির মালা?
মহাবিশ্বের প্রতিটি রহস্য— বিজ্ঞানে আছে আলো জ্বালা।

প্রথম আলো জ্বলে উঠেছিল, এক মহাবিস্ফোরণে,
বিগ ব্যাং নামক রূপকথা, আজ বাস্তব যুক্তির কণে।
সময়-স্থান একসাথে বুনে, সৃষ্টি হলো কালের রেখা,
তারার জন্ম, কৃষ্ণগহ্বর, সবই যেন এক মহামন্ত্র লেখা।

নিউট্রন তারা, ধুমকেতু, ব্ল্যাক হোলের গর্জন,
লুকিয়ে থাকা ডার্ক এনার্জি — গায় অজানার সঙ্গীতচরণ।
গ্রহের বুকে জল খোঁজে, এলিয়েনের একটুখানি ছোঁয়া,
এই জগতের প্রতিটি প্রশ্নে, বিজ্ঞান দিচ্ছে নিত্য নয়া।

মহাকাশযান ছুটছে দূরে, পার হচ্ছে নক্ষত্রপুঞ্জ,
মানবমন ছুঁতে চায় সেই সীমাহীন শূন্য গুণ।
চাঁদে পা রাখা শুধু শুরু, মঙ্গল আজ স্বপ্ন নয়,
মহাজগতের অসীম পথেই ভবিষ্যতের সন্ধান রয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান, মহাকাশতত্ত্ব— শুধু বইয়ের পাতায় নয়,
এ জীবন জুড়ে এক অভিযাত্রা, যাকে প্রেম বলেও হয়।
নক্ষত্রে ভরা আকাশ দেখি, চোখে জ্বলুক প্রশ্নপূর্ণ জ্যোতি,
“আমি কে, কোথা থেকে এলাম?” — উত্তর লুকায় সেই অসীম সত্ত্বার কোঠি।

সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত দুই প্রত্নলেখ'র আলোকে দুই ভিন্ন ঐতিহাসিত প্রেক্ষিত

ঋতুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

দ্বাদশ শতাব্দীতে কলহন রাজতরঙ্গিনীর ভুমিকায় দেখিয়েছিলেন কাশ্মীরের ইতিহাস রচনায় প্রাথমিক তথ্যসূত্রের ব্যবহার কীভাবে করেছিলেন। যদিও ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্যসূত্রের ব্যবহার ইউরোপে স্বীকৃতি পায় উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান ইতিহাসবিদ লিওপোল্ড ভন র্যাঙ্কের হাত ধরে এবং পরবর্তী সময়ে সারা পৃথিবীতেই ইতিহাস রচনা নৈর্ব্যক্তিক এবং তথ্যনির্ভর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ইতিহাসের ধারা প্রবন্ধে দেশ ও কাল ভেদে এই প্রাথমিক তথ্যসূত্রের বিভিন্নতা এবং বিচিত্রতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং সতর্ক করেছেন একই ধরণের তথ্যসূত্রের সমস্ত প্রেক্ষিতে নির্বিচার ব্যবহার 'ধানের ক্ষেতে বেগুন' খোঁজার সমতুল্য হয়ে দাঁড়াবে। ভারতে আধুনিক ইতিহাস চর্চার সূত্রপাতও উনবিংশ শতাব্দীতে এবং এই চর্চার সূত্রপাত হয়েছিলো অনেকাংশে বিভিন্ন প্রাথমিক তথ্যসূত্রের অনুসন্ধানের মাধ্যমে। প্রথম পর্বের ভারত ইতিহাসচর্চাকারীরা ভারত ইতিহাসের প্রাথমি তথ্যসূত্র হিসাবে প্রত্নলেখবিদ্যার চর্চার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ১৮৩৭ সালে জেমস প্রিন্সেপ কর্তৃক অশোকের অনুশাসঙ্গুলির পাঠোদ্ধার এই চর্চার যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলো পরবর্তী শতাব্দীতেও সেই চর্চা অব্যহত থাকে। সমালোচকরা প্রত্নলেখগত উপাদানকে 'পাথুরে প্রমাণ' (যদিও শুধু পাথরে খোদিত নয়) বলে ব্যঙ্গ করলেও এতে খোদিত তথ্যসমূহের গুরুত্ব ম্লান হয়নি। প্রাথমিক ভাবে মূলত রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হলেও বিংশ শতাব্দীতে দীনেশ চন্দ্র সরকার, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের হাত ধরে প্রত্নলেখবিদ্যা চর্চার বিভিন্ন নতুন আঙ্গিক আবিষ্কৃত হয়। প্রত্নলেখসমূহ যে নিছক রাজা বা ব্রদেল কথিত 'বড় মানুষ'দের তথ্য সরবরাহ করে এই ধারণার ক্রমাগত পরিবর্তন হয়েছে। নতুন নতুন প্রত্নলেখ'র আবিষ্কার ইতিহাস চর্চার অভিমুখে পরিবর্তন এনেছে এবং বহু বিচিত্র তথ্যের উদ্ঘাটন প্রত্নলেখ সমূহকে ইতিহাসবিদগণের কাছে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। বর্তমান প্রবন্ধ অতি সাম্প্রতিক কালে ২০২৫ সালে প্রাপ্ত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের দুটি অভিলেখমালা নিয়ে, যেগুলিতে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে।

প্রথম প্রত্নলেখটি বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীশৈলমের মল্লিকার্জুন স্বামী মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ এবং ২০২৫ সালের জুন মাসে আবিষ্কৃত। নাগরী লিপিতে ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই লেখটি মন্দিরের ঘণ্টামণ্ডপমে আবিষ্কৃত হয়েছে। লেখ অনুসারে এটি উৎকীর্ণ হয়েছিলো ১৩৭৮ শকাব্দের আষাঢ় মাসের বহুলা একাদশীর দিন অর্থাৎ ১৪৫৬ সালের ২৮শে জুন। সেই সময়ে এই অঞ্চলে রাজত্ব করছেন বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা মল্লিকার্জুন। কিন্তু লেখতে যে তথ্য আছে তা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে আকাশে একটি ধূমকেতু পরিলক্ষিত হয়েছে এবং উল্কাপাত হয়েছে। যেহেতু ধূমকেতুর আবির্ভাব অশুভ সংকেতবাহী তাই নিজের সাম্রাজ্যকে ধূমকেতুর অশুভ প্রভাব থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যে রাজা মল্লিকার্জুন একটি শান্তিপূজার আয়োজন করেছেন (প্রকাশস্য মহোৎপাত শান্ত্যর্থম দত্তবন বিভু) এবং এই পূজা উপলক্ষে লিঙ্গনার্য্য নামক একজন বৈদিক জ্যোতির্বিদকে সিঙ্গাপুরা নামক একটি গ্রাম দান করেছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে ধূমকেতু দর্শন এবং উল্কাপাত একটি অতি সাধারণ ঘটনা। মধ্যযুগে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর অন্যান্য বিভিন্ন দেশের মতো ভারতেও ধূমকেতু বা উল্কার মতো বিষয়টিকে অশুভ ইঙ্গিত বহনকারী বলে মনে করা হতো। কিন্তু এই লেখতে উল্লিখিত

ধূমকেতু কোনো সাধারণ ধূমকেতু না, এটি হলো হ্যালির ধূমকেতু। ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ এডমণ্ড হ্যালি ১৬৮৪ সালে এই ধূমকেতু দেখেন এবং নির্ধারণ করেন প্রতি ৭৬ বছরে এই ধূমকেতু একবার পৃথিবীর আকাশে দৃশ্যমান হয় এবং সেই হিসাবে ১৪৫৬ সালের জুন মাসের ঐ সময়ে এই ধূমকেতু পরিদৃশ্যমান হয়েছিলো। এডমণ্ড হ্যালির ২২৮ বছর পূর্বে শ্রীশৈলমের একটি মন্দিরপগাত্রে উৎকীর্ণ লেখতে এই ধূমকেতুর উল্লেখ নিঃসন্দেহে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। সম্ভবত এর পূর্বে এই ধরণের অন্য কোনো উপাদানে হ্যালির ধূমকেতুর উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় লেখটি কিছুটা পরবর্তী সময়ের এবং বিজয়নগরের রাজা অচ্যুত দেবরায়ের সমকালীন। এটিও একটি মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ, যদিও মূল প্রত্নলেখটি একটি অদ্ভুত দর্শন মূর্তির চারপাশে খোদিত। ২০২৫ সালের মে মাসে কর্ণাটকের গুট্টলার চন্দ্রশেখর মন্দিরে খননকার্য চালাতে গিয়ে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণ এর হাম্পি অঞ্চলের এক দল প্রত্নতত্ত্ববিদ এই লেখটির সন্ধান পান। লেখটি প্রচলিত হয়েছিলো ১৪৬১ শকাব্দের ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে অর্থাৎ ১৫৩৯ সালের আগস্ট মাসের ১৮ তারিখ। লেখতে যে তথ্য আছে তা নিদারুণ। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ওই অঞ্চলে তীব্র খরার কারণে ৬৩০৭ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁদেরকে মারুলাই ওডেয়া নামক জনৈক ব্যক্তি সমাধিস্থ করেছেন। ওই অঞ্চল বা 'সীমে'র স্থানীয় শাসক তিম্মরস স্বামী নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য মৃতদের স্মৃতির উদ্দেশে এই লেখটি উৎসর্গ করেছেন। প্রত্নলেখটির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূর্তিটিও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই মূর্তিতে দেখা যাচ্ছে এক বিশাল দর্শন ব্যক্তি এক হাতে মাটি কোপানোর একটি যন্ত্র ধরে আছেন এবং অন্য হাতে মাথায় একটি ঝুড়ি (স্থানীয় ভাবে ঝাল্লে নামে পরিচিত) ধরেছেন এবং এই ঝুড়ির মধ্যে অসংখ্য মৃতদেহ। এই ব্যক্তির সামনে একটি শিবলিঙ্গ এবং সম্ভবত এই শিবলিঙ্গের নীচের অংশেই এই মৃতদেহগুলিকে প্রোথিত করা হবে। লেখটি থেকে অনুমিত হয় এই বিশাল দর্শন ব্যক্তি হলেন মারুলাই ওডেয়া এবং তিনি এই মৃতদেহগুলিকে বাসবেশ্বর বা ভগবান শিবের করুণাপ্রাপ্তির জন্য তাঁর লিঙ্গের নিকট সমাধিস্থ করেন। এই লেখটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য আমাদের ইতিহাসের দুটি প্রেক্ষিতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত, কর্ণাটকের বিভিন্ন অঞ্চলের জলকষ্ট ও খরা পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির কারণেই বিজয়নগর ও বাহমনী দুটি শক্তিই তুঙ্গভদ্রা নদী উপত্যকা অধিকার করতে উদ্গ্রীব ছিলো। দ্বিতীয়ত, এর পূর্বে প্রাপ্ত কোনো প্রত্নলেখমালায় এত সংখ্যক মানুষের এক সঙ্গে মৃত্যুর উল্লেখ পাওয়া যায়নি। এই বিশাল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অভিঘাত ভবিষ্যত গবেষণা সাপেক্ষ।

এই প্রবন্ধে বিজয়নগর সাম্রাজ্যকালীন প্রচলিত দুটি প্রত্নলেখে কীভাবে দুটি ভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত পরিবেশিত হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত হলো। তবে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এই দুটি লেখতেই আলোচনার কেন্দ্রীয় চরিত্র কিন্তু কোনো রাজা বা তথাকথিত 'বড় মানুষ' নন। ইতিহাস অনুসন্ধানের ধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুও যে ক্রমাগত পরিবর্তন হয়েছে এবং কালক্রমে ইতিহাস যে অতি সাধারণ মানুষের জীবন এবং জীবনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ঘটনাকে তার আলোচনার পরিধির মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছে তার প্রমাণ বহন করে এই প্রকার প্রত্নলেখগুলির চর্চা।

তথ্যঋণ :–

রাজতরঙ্গিনী – অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইতিহাস ও সাহিত্য – অশীন দাশগুপ্ত

আলোচিত প্রত্নলেখগুলির ছবি ও পাঠ এপিগ্রাফিকাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া সূত্রে প্রাপ্ত। উক্ত প্রত্নলেখ দুটির সম্পূর্ণ পাঠ এখনো অপ্রকাশিত।

বিপন্ন শৈশব ও টেলি প্রজন্ম

মুন্নালাল টিকাইত
অধ্যাপক – রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

বর্তমান সময়ে আমরা এক জটিল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করছি, যেখানে একজন শিশু তার শৈশব বিভিন্ন প্রকার যান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছে। আজকাল প্রায় অধিকাংশ শহর মফস্বলের মধ্যবিত্ত পরিবার গুলিতে বাবা-মা দুজনেই চাকরি বা বিভিন্ন কাজে সারাদিন ঘরের বাইরে থাকার প্রচলন বেড়েছে। যার ফলে এই বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে ছোট্ট বাচ্চাদের কাছে টিভি বা ভিডিও গেমস হাইটেক বেবীসীটারের ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। অনেক পরিবারেই দুপুরবেলা বা অন্য সময়ে বাচ্চা সামলানোর জন্য কাজের লোক রাখা হয়, কিন্তু সেই কাজের লোকও নিজেই বাচ্চাদেরকে নিয়ে টিভির পর্দায় চোখ সেটে বসে থাকে, স্বাভাবিকভাবেই এই অবস্থায় বাচ্চাকে টিভি দেখা থেকে বিরত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এখন তো অনেক পরিবারেই সন্তান একটি, ফলে সেই পরিবারের সন্তানের সমস্যা আরো বেশি, তার সঙ্গে খেলার কোন সঙ্গী নেই। যতদিন যাচ্ছে ততই যৌথ পরিবার ক্রমশ বিলীন হয়ে পড়ছে, বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যাও বাড়ছে, ঘরে ঘরে এখন আর ঠাকুমা-দাদু নেই। ফলে নিঃসঙ্গ পারিবারিক আবহাওয়ায় একজন শিশুর কাছে শৈশবের একমাত্র সঙ্গী হয়ে পড়ছে টিভি। যার ফলে ক্রমশ টিভিই যেন হয়ে পড়ছে একজন শিশুর কাছে থার্ড প্যারেন্ট বা তৃতীয় অভিভাবক।

শিশু মনের বিকাশের জন্য সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার বিশেষ অবদান বা ভূমিকা রয়েছে। শিশুদের শৈশব অবস্থায় ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার সময় তাদের বিভিন্ন প্রকার অভ্যাস, আচার-আচরণ, পছন্দ অপছন্দ, আদব কায়দা গড়ে ওঠে বা তৈরি হয় অন্যকে দেখে শেখার মধ্য দিয়ে। অন্যকে দেখে শেখার বিষয়টা তাদের স্বভাবজাত গুণ, আর এটাই স্বাভাবিক বিষয়। এইভাবে দিনের পর দিন তাদের চোখের সামনে দেখা বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতা থেকে তারা সমাজটাকে বুঝতে শেখে, যদিও এই শৈশব বয়সে একজন শিশুর কাছে এই প্রক্রিয়া যথেষ্ট জটিল। কিন্তু এরূপ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই একজন শিশু ও কিশোরদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে থাকে। পূর্বে শিশুর সামাজিক ধারণা মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাবা-মা ও পরিবারের লোকজনের একটা বড় ভূমিকা থাকতো। এখন কর্মব্যস্ত জীবনে পরিবারের লোকজনের একজন শিশুর প্রতি সময় দেওয়ার বড়ই অভাব, তাই এই অভাবের তাড়নায় একজন শিশুর মূল্যবোধ তৈরি করার ক্ষেত্রে দূরদর্শন বা টিভি একটি বড় ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই কারণেই সারা বিশ্ব জুড়ে শিশু কিশোরদের উপর টেলিভিশনের যে প্রভাব তা যথেষ্ট চিন্তা ও উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলছেন, শৈশব অবস্থায় শিশুদের অতিরিক্ত পরিমাণে টিভি দেখার অভ্যেস তাদের জীবন সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা উপর যথেষ্ট নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যার ফলস্বরূপ শিশুদের পড়াশোনার অভ্যাস ও পরিমাণ দুটিই কম হতে শুরু করে। এছাড়াও বাচ্চার জীবন সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা ভাবনার উপর নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ড: হরিশ চেল্লানি দিল্লিতে একটি সমীক্ষা করে জানিয়েছেন, দৈনিক দু'ঘণ্টার বেশি টিভি দেখলে শিশু মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় ও পড়াশোনার মান উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। আর পড়াশোনার অভ্যাস কমে যাওয়ার অর্থ হল শিশু মনের চিন্তা শক্তির বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

অবশ্যই এক্ষেত্রে একটি বিষয় কোনোভাবে উপেক্ষা করা যায় না সেটা হলো যে সকল বাচ্চারা অত্যাধিক সময় ধরে টিভিতে মুখ গুঁজে রাখতে ব্যস্ত থাকে সেই সকল বাচ্চাদের অন্যদের সাথে মেশার ক্ষমতা অনেকটাই

কমে যায়, তারা অনেকটাই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। সেই সব শিশুর মনে ধারণা গড়ে ওঠে যে জীবনটাই বোধহয় এইরকম অর্থাৎ টিভিটাই তাদের কাছে হয়ে ওঠে জীবনের আদর্শ নির্ধারক। যার ফলস্বরূপ বাস্তব জীবনের নিজেদের প্রকৃত ক্ষমতা সম্পর্কে গড়ে ওঠার ধারণা বাধা প্রাপ্ত হয়। ফলে তাদের জীবনে শুরু হয় অর্থহীন বেপরোয়াপনা, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বিপন্নতাবোধকে বাড়িয়ে তোলে।

এরকম অবস্থায় আমাদের অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন টিভি দেখে বাচ্চারা কি শিখছে, বর্তমান প্রজন্মের কাছে টিভির প্রদর্শিত বিষয়াবলী কিরূপ? টিভির বেশিরভাগ প্রদর্শিত বিষয়াবলীর মধ্যে থাকছে নিরন্তর সেক্স, ভায়োলেন্স, বিজ্ঞাপনী প্রচারের নামে নারী শরীর প্রদর্শনের বাহার, অবাধ যৌনতা, মাদকাসক্তি ও অ্যালকোহলের প্রসিদ্ধ প্রচার ও পশ্চিমী সংস্কৃতির এক বিকৃত দিকগুলির উপস্থাপন ও ভোগবাদী জীবনযাত্রার প্রতি মহত্ব প্রচার। যেখানে রয়েছে বিজ্ঞাপনী প্রচারের রমরমা ও ছড়াছড়ি, এখনতো বিজ্ঞাপনী প্রচার এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছে যেখানে একটা দশ মিনিটের কোন প্রোগ্রাম দেখতে হলে আপনাকে দুবার বিজ্ঞাপন দেখতে হবে, আর বেশ কিছু বিজ্ঞাপনের রুচি এতই নিম্নমানের যে আপনি স-পরিবারে বসে একসাথে একটা সংবাদ পর্যন্ত দেখতে পারবেন না। কারণ একটা দশ মিনিটের সংবাদ পরিবেশনের মাঝেও দুবার বিজ্ঞাপন পরিবেশিত হবে, আর সেই বিজ্ঞাপন আপনি পরিবারের ছোট বড় বাড়ির সকলের সাথে একসঙ্গে দেখতে পারবেন না তা আপনার রুচিতে বাঁধবে। একটি আধ ঘন্টার প্রোগ্রাম দেখার জন্য আপনাকে বেশ কয়েকবার বিজ্ঞাপনের সম্মুখীন হতে হবে। যেন ওই বিজ্ঞাপন দাতাদের দয়াতেই আপনি টিভি প্রোগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন, আপনাকে আলাদা করে কোন কেবল কোম্পানিকে টাকা প্রদান করতে হয়নি।

সমস্যার বিষয় হলো বাড়ির মা জেঠিমারা যখন সারাদিনের সাংসারিক পরিশ্রম করার অবকাশে একটু টিভি সিরিয়াল দেখার জন্য বসেন, তখন বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের সঙ্গে বসে পড়ে টিভি সিরিয়াল দেখার জন্য, আর অসুবিধার জায়গা হল এখানেই, এখনকার বেশিরভাগ টিভি সিরিয়ালই হলো ঝগড়াঝাটি, হিংসাত্মক ও অসামাজিক কার্যকলাপের উপস্থাপনায় ভরপুর। এইসব দেখে শিশুদের মনে যথেষ্ট খারাপ প্রভাব পড়ছে, অন্যান্যদের সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ ধারণা তৈরি হচ্ছে।

বর্তমানে সকল বাড়িতেই টিভি ও কেবল কানেকশনের ছড়াছড়ি, যার ফলে বাড়ির শিশুদের কাছে টিভি দেখার সুযোগ হাতে পাওয়াটা অতি সহজ বিষয়। এইভাবে বহু বাড়িতেই শিশুরা টিভি দেখার পিছনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে বসে, এইভাবে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, যে সময়গুলো তারা বন্ধুদের সাথে মেলামেশা, হোমওয়ার্ক করা, বাইরে মাঠে গিয়ে খেলাধুলা এবং অন্যান্য অনুরূপ কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে যেকোনো উৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করতে পারত।

যেসব শিশুরা প্রতিদিন গড়ে দু-তিন ঘন্টা সময় ব্যয় করে থাকে টিভি সিরিয়াল দেখার কারণে, সেইসব শিশুরা প্রায়শই শ্রেণিকক্ষের পরিবেশে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এই সব ধরনের শিশুরা বিভিন্ন প্রকার সৃজনশীল এবং মানসিকভাবে শান্ত করার যে কোন প্রকার কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হতে পারে। যেসব শিশু অতিরিক্ত পরিমাণে টিভি দেখে তাদের স্থূলতা এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্যগত ব্যাধি হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। বিভিন্ন প্রকার গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত পরিমাণে টিভি দেখা শিশুদের মস্তিষ্কের গঠন পরিবর্তন করে দিতে পারে। যার ফলে বিভিন্ন প্রকার নেতিবাচক আচরণের জন্ম দিতে পারে, বিশেষ করে হিংস্রতা ও আগ্রাসন। এইসব বিষয়গুলি ঘটতে পারে যে সকল শিশুরা অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অনুপযুক্ত বিষয়বস্তু সম্বলিত অনুষ্ঠান বেশি করে দেখে তাদের মধ্যে এসব সমস্যার ঝুঁকি বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। যেসব শিশুরা তাদের বাড়িতে টিভি দেখার ক্ষেত্রে যৌনতা, মাদক এবং মধ্যপানের উপর আলোকপাত করে এরকম অনুষ্ঠান বেশি পরিমাণে দেখে, তখন সে ক্ষেত্রে তাদের মানসিক পরিবর্তন সাধনের

সম্ভাবনা অনেক বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এর অন্যতম কারণ হলো এই সকল বিষয়গুলি তাদের মানসিকভাবে প্রভাবিত করে, এর মূল কারণ হলো তারা এই সকল বিষয়গুলির অনেক কিছুই জানার জন্য খুবই ছোট।

বর্তমান কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রায় অনেক সময় বাবা মায়েরা নিজেদের একটু মুক্ত থাকার জন্য শিশুদের টিভির সামনে বসিয়ে দিয়ে হাতের রিমোট ধরিয়ে দেয়। এর ফলে শিশু নিজের হাতে রিমোট পেয়ে যেকোনো চ্যানেল দেখতে শুরু করে, কোনগুলো তার দেখা উচিত ও কোনগুলি তার দেখা উচিত নয় এগুলির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করার বোধশক্তি তার মধ্যে থাকে না, এক্ষেত্রে বাবা মা নিজেদের অজান্তেই নিজের সন্তানের ক্ষতি করছেন।

সবশেষে একটি বিষয় পরিষ্কার বর্তমান কর্মব্যস্ত জীবনেও শিশু বা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অনেক দায় দায়িত্ব থেকে যায়, এই বিষয়গুলি শিশুর শৈশব অবস্থা থেকেই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন। যে বিষয়টি খুবই জরুরী তা হল শিশুর মধ্যে শৈশব অবস্থা থেকেই বই পড়ার অভ্যেস গড়ে তোলা প্রয়োজন, এ প্রসঙ্গে কয়েক বছর আগের একটা খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে মাধ্যমিকে প্রথম স্থান অর্জনকারী একজন ছাত্রের মায়ের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে সেই ভদ্রমহিলা জানিয়েছেন, ছেলের পড়াশোনা ব্যাহত হবে একথা ভেবে তারা তখনো পর্যন্ত কোনো টিভি কেনেননি। এই যে সন্তানের ভালো মন্দের জন্য অভিভাবকের অগ্রাধিকার বোধ, এটাই সন্তানের উপর প্রভাব ফেলে। আজকাল শহরে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের বাবা মায়েরা তাদের সন্তানদের অনেক সময়ই বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ রেখে দেন, এটা একেবারেই ঠিক নয়, বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাকে পরিচিত করে তোলা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

1. টেলি প্রজন্মের সংস্কৃতি, অঞ্জন বেরা, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি 1998.
2. John coundry, The psychology of television (New Jersey Lawrence erlbaum, 1989).
3. Neeraj Mishra, No kidding, Television changes your Brain, Indian express (New Delhi) October 22, 1994.
4. The CQ Researcher, volume 3, number 12, March 26, 1993.
5. Steed, Wickham, the press (Har mondsworth: penguin, 1938)
6. https://www.britannica.com
7. https:// motherlandhospital.com
8. https:// en.wikipedia.org

সলিল চৌধুরী : আমার অনুভবে

হেমন্ত পাল
অধ্যাপক (সঙ্গীত বিভাগ)

সুরশ্রষ্ঠা সলিল চৌধুরি পৃথিবীর গাড়িটা থামিয়ে অন্য অজানা গাড়ি ধরে অনন্তে পাড়ি দিয়েছেন (১৯২৫-১৯৯৫) প্রায় তিনদশক। রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে বাংলা গানে সার্থক কম্পোজার হিসাবে তাঁর কথাই সর্বাগ্রে মনে আসে। বাংলা সঙ্গীত জগতে সলিল চৌধুরির স্থান প্রথম কয়েকজনের মধ্যেই। বৈচিত্র্যে তিনি সম্ভবত সকলের আগে। গীতিকার সুরকার দুই পরিচয় মিলিয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরেই তাঁর স্থান। তিনি একজন সফল কবি বললেও দোষের নেই। কিন্তু আমরা এঁদের গীতিকার বলতে অভ্যস্ত। কারন যাঁরা সুরের প্রয়োজনে লেখেন তাঁদের ছন্দ ত্যাগ করার উপায় নেই। ছাত্র জীবন থেকে আমৃত্যু হাজার খানেক কবিতা লিখেছেন তিনি। এগুলির অধিকাংশই তিনি সুর সংযোগে গানে পরিনত করেছেন। আমরা যারা নব প্রজন্মে সঙ্গীত জগতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে তারা যদি সলিল সাগরে ডুব দিয়ে এককনা ঝিনুক তুলে আনতে পারি তাহলে নিজেদের ধন্য মনে করবো।

আট বছর বয়সে সুন্দর ভাবে বাঁশি বাজানো থেকে শুরু করে যুবা বয়সে পিয়ানো বাজাতে শেখেন এবং জীবনের অধিকাংশ সুরসৃষ্টি পিয়ানোয় বসে করেন। তবে তিনি বাঁশি এবং পিয়ানোর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, পারদর্শী হয়েছিলেন বেহালা, গিটার ও এসরাজ বাদনেও । রেকর্ডে প্রথম যে গানটি তাঁর প্রকাশিত হয় তা হল গনসঙ্গীত "নন্দিত নন্দিত দেশ আমার"। ১৯৪৪ সালে তিনি যখন উচ্চশিক্ষা গ্রহনের জন্য কলকাতায় আসেন তখন "ভারতীয় গননাট্য সংঘের" সাথে সংযোগ ঘটে। একই সময়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রগতিশীল গনআন্দোলনে শামিল হন এবং গনসঙ্গীত রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর গানের অঙ্গনে প্রবেশ। তাঁর কলমে বেরিয়ে আসে তেভাগা আন্দোলন নিয়ে "হেই সামাল, হেই সামাল" ও "আলোর পথযাত্রী"। তাঁর সঙ্গীতের জয়যাত্রা শুরু হয়ে ধীরে ধীরে জনমানসে প্রভাব ছড়িয়ে দিতে শুরু করল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সঙ্গীত চিন্তা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন "সঙ্গীতে এতখানি প্রান থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, সমাজের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে, সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে ও তাহার উপর সমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়"। সলিল চৌধুরি গনসঙ্গীত কর্মশালায় তাঁর উপস্থিত বক্তব্য থেকে জানা যায় " প্রত্যক্ষভাবে যারা গনআন্দোলনে জড়িত নন, গনআন্দোলনকে যারা নিজের করে নিতে পারেননি, তাদের কাছে গনসংগীত তাত্ত্বিক কচকচি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মাঠে ময়দানে, কলকারখানায় বিভিন্ন গনআন্দোলনের শারিক হিসেবে যে শিল্পীরা কাজ করেন তাদের গলায় যে সঙ্গীত স্বতস্ফূর্তভাবে তা লোকসঙ্গীতের আঙ্গিকে হোক, আধুনিক সঙ্গীত হোক, কিংবা পাশ্চাত্য প্রভাবিত সঙ্গীত হোক তাঁর বক্তব্যে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর সংগ্রামের ছবি ফুটে উঠে"। কৃষকদের প্রধান উৎপাদিত খাদ্যশস্য ধান থেকে কি ভাবে সংগ্রামের উদ্দীপনা জাগাতে পেরেছিলেন তার প্রমান " হেই সামাল ধান হো" গানটি তে। সেখানে কৃষকদের ধান সামলে রাখার কথা বলা হয়েছে। কেরালায় একটি বিচারের মাধ্যমে কৃষকদের ফাঁসিতে শাস্তি দানের প্রতিবাদে সলিল চৌধুরির কলম থেকে ঝরে পড়েছিল সেই গান "বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা"। ১৯৫১ সালে "Modern Bengal Music in crisis" প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন "আজকের দিনে এমন গান তৈরি হওয়া দরকার যা মানুষের জীবনের কথা বলে"। এই বোধ থেকেই তিনি সংগীত রচনা করেছেন। তাঁর একের পর গনসঙ্গীত আজও আমজনতার মুখে মুখে ফেরে। কেউ কেউ তাঁর গানকে বলতেন জাগরনের গান, চেতনার গান। তাঁর রচিত গনসঙ্গীতের সংখ্যা শতাধিক। কয়েকশো

রক্ষণাবেক্ষণ করা গেলেও সমস্ত গান গতি করা সম্ভব হয়নি।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে এবং বোম্বাই যাবার পরে পঞ্চাশের দশকে তাঁর ট্রানজিশন সহজেই চোখে পড়ে। বাজারের দাবীতে তিনি নিজেকে পুনর্গঠিত বা রিঅর্গানাইজ করেছেন মাত্র। তবে কোথাও তিনি তাঁর প্রতিবাদী সত্তাকে ঢেকে রাখতে পারেননি। বিশেষজ্ঞদের মতে সঙ্গীত জীবনে তাঁর দুটি যুগ। দুটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। ১৯৪২-১৯৫২হল আর্দশবান যুবক অ্যমেচার সঙ্গীতজ্ঞ এবং লেখক। ১৯৫২-১৯৯২ যুগন্ধর সঙ্গীতজ্ঞ পরিনত সলিল চৌধুরি । ১৯৪৮ “গাঁয়ের বধু” গানের রেকর্ড তাঁকে এক ধাক্কায় প্রথম সারির শিল্পীদের পাশে বসিয়ে দেয়। ১৯৫২ সালে কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের “পালকীর গান” এবং দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় কন্ঠে তাঁরাই রচিত এবং সুরে “ শ্যামল বরনী ওগো কন্যা” গানের বাজারে পূর্নতা এনে দেয়। ১৯৫৩-১৯৫৮ হেমন্ত, উৎপলা, প্রতিমা এবং শেষে সবিতাকে দিয়ে কালজয়ী সব গান তৈরি করেন।

পিতার সংগৃহীত কিছু বিদেশী গান ও যন্ত্রসংগীতের রেকর্ড শুনে পশ্চিমী সুরের প্রতি আকৃষ্ট হন। ষাটের দশকে ক্ল্যাসিক্যাল এপিক থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে গিয়ে হাত রাখলেন ঘুমন্ত লাভার আঁচে। সাদরে গ্রহন করলেন জ্যাজ আর ব্লুজকে। ঝরে পড়লো “ এই রোকো পৃথিবীর গাড়িটা থামাও”। আসলে এ তো বিদ্রোহেরই গান। পাশ্চাত্য সঙ্গীত কতটা নিলে ভারতীয় প্রাণ আলোড়িত করতে পারে তা তিনি জানতেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে দেশি মেলেডিকেও চমৎকার ভাবে কাজে লাগিয়েছেনন সুর রচনায়। ভারতীয় সঙ্গীতে ওয়েস্টার্ন মিউজিক এমনভাবে জুড়লেন যাতে তা বিদেশি হয়েও, হয়ে উঠলো দেশীয় গানের ও দেশজ কালের পক্ষে সম্পূর্ন অনুকূল। পাশ্চাত্য সংগীত ছাড়া বিশেষ করে মার্গ সংগীতের অর্কেস্ট্রেশনের প্রয়োগকৌশল নিয়ে এলেন ভারতীয় আধুনিক গানে। গানের নেপথ্যে ‘অব্লিগেটো’র প্রয়োগ তাঁর আগে ভারতীয় সংগীতের শোনা যায়নি। ‘অব্লিগেটো’ অর্থাৎ বিশেষ ধরনের কোরাস ভায়োলিন, যা গানের মূল সুর থেকে একেবারে আলাদা, অথচ নেপথ্যে থেকে অদ্ভুত ব্যঞ্জনা তৈরি করে। যেমন “শোনো কোনো একদিন’ গানটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর প্রতিবাদের গানে তিনি একাধারে এনেছেন গ্রামীন লোকায়ত সুর ও পাশ্চাত্য সংগীতের হারমনি। রাগরাগীনীর এবং পাশ্চাত্য গানের প্রয়োগে যে ট্রিটমেন্ট সেখানে তিনি আনলেন অভিনবত্ব। এছাড়াও স্কেল চেঞ্জ করে বৈচিত্র্য আনার রীতি অনুসরন করলেন। গানে হঠাৎ কোমল থেকে শুদ্ধ বা কড়িতে তাঁর সুর ষড়জের মত পাল্টে যেত। সলিলের সুরের প্রধান উপাদান ছিল উচ্ছলতা এবং সাবলীলতা যা তিনি সময়ের সাথে মেলাতে পারতেন। তাই তিনি হয়ে উঠেছিলেন ট্রেন্ডসেন্টার।

১৯৫২ সাল থেকে “দো বিঘা জমিন” থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই চল্লিশ বছর সলিল চৌধুরি সঙ্গীত পরিচালনায় ৭০টি হিন্দি ছবি মুক্তি পেয়েছে। তারমধ্যে গানে ১০টি সুপারহিট। উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি ‘জাগতে রহো’, ‘মধুমতী, ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘আনন্দ’, ‘রজনীগন্ধা’ ইত্যাদি। হিন্দি চলচ্চিত্রে তিনি রীতিমত পথের দিশারী। তাঁকে সকলে সম্মানের সাথে গ্রহন করেছিল হিন্দি বাংলা ছাড়া ২৭টি মালায়ালাম এবং তামিল ৭ টি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেন। রয়েছে দু একটি করে কানাড়া, তেলেগু, উড়িয়া, অসমিয়া এবং মারাঠি ছবিতে। তাঁর রচিত এবং সুরসংযোজিত গানের সংখ্যা প্রায় বারোশ। বাঙলায় সংখ্যাটি সাড়ে পাঁচশো। কিন্তু সে তো সুরস্রষ্টা সলিল চৌধুরির কীর্তিস্তম্ভ। অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকে সেইসময কয়েকজন কবির কবিতাকে সুর দিলেন। তার মধ্যে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার সুরের ছোঁয়া দিয়ে গড়ে তুলেছেন ‘রানার’ এবং ‘অবাক পৃথিবী’। তিনি মনে করতেন হেমন্ত না থাকলে তিনি এভাবে উঠে আসতে পারতেন না। তাঁর চারদিকে নাম ছড়িয়ে পড়লো যখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রেকর্ড করলেন “কোন এক গাঁয়ের বধূর কথা”। হেমন্তর গলাকে সলিল চৌধুরি বলতেন দেবকন্ঠ। সলিল-হেমন্ত জুটির স্মরনীয় গান ‘ধিতাং ধিতাং বোলে’, ‘পথ হারাবো বলে এবার’,‘ পথে এবার নামও সাথী’, ‘আমি ঝড়ের কাছে’, ‘দূরন্ত ঘূর্ণির’, ‘আমায় প্রশ্ন করে’, ইত্যাদি। সলিলের

গানে আর এক অসামান্য রূপকার লতা মুঙ্গেশকার। লতার অধিকাংশ বাংলা আধুনিকই সলিল চৌধুরির কথা ও সুরে। ‘সাত ভাই চম্পা’, ‘না যেও না’, ‘কে যাবি আয়’, ‘ও মোর ময়না গো’, প্রতিটি গান মানুষকে মনে রাখতে হয়। সেই সময়কার শিল্পীদের মধ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, মান্না দে, আশা ভোঁসলে, শ্যামল মিত্র, দাক্ষিনাত্যের যেসুদাস সহ প্রায় প্রত্যেকেই সলিল চৌধুরির সুর কিংবা কথায় গান গেয়ে তাঁকেই শ্রদ্ধা জানিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন।

জনগনের মনে জায়গা খুঁজে নেওয়া কোন শিল্পীর একটা প্রাথমিক লক্ষ্য যদি হয়ে থাকে তাহলে সলিল চৌধুরির সেই সাফল্য ছুঁয়েছে জনগনের হৃদস্পন্দনে। শেষের পরেও থাকে রেশ। রেশের পরে যা থাকে তা কালজয়ী। রেশই এখনও শেষ হয়নি।

Transformation of Tribal community of South West Bengal

Dr. Uday Sankar Sarkar
Associaote Professor History Depertment

From historical point of view the South West Bengal is considered as very important region from time immemorial. Tribal communities live in this region from time immemorial. The region is popularly known as 'Rarh Bengal'. The word 'rarh' means 'a land of red soil'. Santal Pargana, Hazaribag, Ranchi, Singhbhum, Jhargram Subdividion, Midnapore, Birbhum, Western Burdwan, Purulia and Bankura are considered as 'western rarh'. Jhargram Subdividion, Midnapore, Birbhum, Western Burdwan, Purulia and Bankura are part of south west Bengal. The tribal community (Santals, Chuars, Sabars, Kol, Munda etc.) of western rarh is very old inhabitants. Their cultural activities are very colourful. They have created their own culture and developed their culture through their activities and brotherhood. They developed their own village customs and economy. But when the British penetrated this region with their new concept of land-based economy system the age-old tribal system faced the new challenges.

Tribals are ancient inhabitant of jungle mahal in Indian geographical structure. But we know that, the Santals and other tribals also of this region is considered as backward community. Still, they are backward class from socio-economic angle. The south west Bengal is also considered as Jungle Mahal. The term jungle mahal was applied by the British, because the large tracts of south west Bengal covered by jungles. Even today we see that, the large tracts of this region still cover by the jungles. By nature, the inhabitants of western rarh are basically hard working. The soil of this region is not much fertile for agriculture. The silts of the soil are rough in texture. From the political angle the region is considered as politically disturbed territory. From colonial to post-colonial period the tribals of jungle mahal have shown their agitation regularly against the colonial power and state atrocity (post-colonial period).

From British colonial period the south west Bengal considered as one of the most disturbed regions in eastern India. From colonial to post-colonial period, the tribals of south west Bengal has shown their agitation. They went against the British power in colonial period and after independence they also went against the state atrocity. The eco-social and political transformation was occurred by the middle of the eighteenth century when British East India Company came to India. In 1757 the battle of Plassey gave the opportunity to British East India Company to capture the Bengal economy.

After the battle of Boxer (1764) the company has got the opportunity to capture the political power of Bengal. Gradually they conquered every part of India and they established their colony in India. They introduced the new land system in Bengal. In 1793, they introduced the permanent settlement in Bengal and new land revenue system was introduced by Cornwallis. The new land revenue system was also introduced in south west Bengal. The jungle zamindars' and tribals' of this region could not agree to accept the new land system. Because, the jungle zamindars' and the tribals' of south west Bengal enjoyed independent power on their land. Jungle zamindars enjoyed tax free land from time immemorial from the Rajas of this tract. On the other hand, the tribals are natural inhabitants of south west Bengal and they believe that, the forest, land and water is God gifted. From time immemorial they collect the forest product from jungle and prepared jungle land for cultivation. They believe that, the land, jungle, flora and fauna are God gifted. But colonial authority encroached the forest land and introduced various regulations to use the forest. Naturally, the tribals of these tracts went against the British colonial power. In post-colonial period we have noticed the 'Lalgarh movement'. The movement was basically led by the non-tribals, but tribals were also involved with this. That was the political transformation of the tribals of this tract.

All the tribal movement is similar by their nature. In colonial period the tribal movements were directed against anti-colonial aggression and directed against the native collaborators of British. Their anti-colonial movement turned into national movement. For example, the santal movement (1855) gave the impetus to other national movement in colonial India. The Santals wanted to establish the santal raj. They wanted to demolish the colonial power. They totally ignored the colonial government and similarly, the Chuars of jungle mahal wanted to demolish the colonial power and they wanted to establish their own age-old system through their local rajas or zamindars (jungle zamindars) of jungle mahal. The inhabitants of jungle mahal totally ignored the company rule and refused to pay land tax. The movement of the tribals of colonial period is considered as freedom struggle movement. In post-colonial period the tribal movement is directed against the state power (particularly against the police atrocity). They were involved in the movement to protect the right to the rights granted to them in the Indian constitution. They do not say to leave India. But in colonial period, they wanted to get rid of foreign rule during foreign rule. But after independence, they wanted to demand for their separate state within the Indian dominion. For example, the Jharkhand movement, and immediate affect was created the new state, i.e., Jharkhand state.

The Jharkhand movement occurred in post-colonial period in twentieth century in eastern India. The demand of separate Jharkhand state was started from colonial period and tribal leaders of this movement wanted the socio-economic development of the tribals. The movement has got its new dimension after the independence of India. In 15th November 2000 the Jharkhand emerged as separate state in independent India. Nowadays Jharkhand gradually is changing in the context of demography, industrialization and urbanization. Many tribal leaders of Jharkhand get the opportunity to prove their leadership in Indian Loke Tantra. Jharkhand has produced many tribal leaders. Many of them has got ministry.

Now we move to Lalgarah movement. Basically, the movement created against the police atrocity in Lalgarh in south west Bengal. The movement was led by Chatradhar Mahato of Mahato community and he formed the party, i.e., 'police santras birodhi janaganer committee'(PSBJC). The tribals of Lalgarh joined with Chatradhar against the police atrocity. Their demand was simple and not to demand for their separate state. Ultimately, they demand for their socio-economic development for their community and their territory. Because, their territory was neglected by the Left Government of West Bengal from many years. Actually, the tribals of Lalgarh was demand for their basic democratic rights. The movement was started against the police atrocities, secondly, demand for democratic right and thirdly, demand for the development of tribal territories of jungle mahal. They also demand of compensation and they wanted to stop the illegal arresting of the tribals. They wanted to abolish every harassment in their territory. So, their demand was simple but it was very important from the angle of the tribals. Not only that, Bharat Jakat Majhi Mawra Group organized a rally against the Maoist violence. That was very significant in terms of political angle. Obviously, the leadership came from non-tribal group but the tribals of this region was came forefront against the police atrocities. They did not demand for separate state.

The territory of jungle mahal was under developed from colonial period. Once upon a time the region has not such any basic livelihood. Thus, the external power gradually increased their activities and they wanted to make separate the region from main stream of socio-political route. The external power captured the young tribals and insisted them to go against the state power. But now a day the picture is changing. The tribals are involved in various developmental project. The state Government takes initiative for the development of the tribals of this region. Government provides different facilities to the tribals, such as, health, education, drinking water, sanitation, Kanyasree, sabuj-sathi etc. Government also provides rice to the tribals @2 per kg.

State Government establishes the Pashchimanchal Unnayan Parsad for the development of the jungle mahal. The state Government also established the Khatra Sports Academy near Mukut Manipur for the development of sports of Bankura. Government establishes law and order situation in jungle mahal. Many tribals of jungle mahal are joining in different Government jobs. The Government gives the priority for teaching in Alchiki language and recruited 1800 teachers for teaching in Alchiki language in 900 schools. 1 Obviously, road construction, employment generation, housing for the poor people, safe drinking water in the villages, and watershed management projects will be the main vehicles of the development in the Maoist affected jungle mahal. 2 Our chief minister raised the issue including Purulia and Bankura under the Integral Action Plan (IAP) of the union government and west Midnapore has already got special assistance from the centre under the IAP.3 The developmental scheme proposals are for public infrastructure and services such as schools, Anganwadi centres, primary health centres, drinking water supply, village roads and lights in public places.4 The tribal sub plan strategy adopted during the fifth plan is being implemented by the centre as well as the state government through various schemes and in addition to special central assistance to the TSP grants are also being provided to the state governments to implement specific schemes for the welfare and development of ST. 5 In this regard we can say that, various schemes and projects are taken by the government for development of the tribals in post-colonial period. But still now they are treated as under privileged class of Indian territory. In jungle mahal region we have notice that, there are two types of santal class, one is elite santal class and another is non-elite santal class. Mostly the elite santal classes are Christian Santals and some are non-Christian santal class. Elite Santals mostly live in town and city areas and they adopting modern culture and amusements. But the real fact is, the majority of non-elite santal classes are still backward and they are separate from the main stream society in Indian civilization and still looking for their socio-economic freedom. The socio-economic struggle of Santals is still going on.

References:

1. *The Indian Express*, *Sarenga*, *Bankura*, *Wednesday*, 13*th July* 2011
2. *The Telegraph*, *Jungle Mahal Development Drive*, *Calcutta*, *India*, *Saturday*, 22*nd October*, 2011
3. *Ibid*
4. *Ibid*
5. *National Portal Content Management Team*, *Reviewed on* 29-04-2011

Learning Physical Geography through Filmy Lens

Dr. Abira Dutta Roy, Assistant Professor Department of English

Visual depiction has always been an excellent tool in elucidating complex phenomenon. Especially in geography as a student the black and white sketches of various landforms in the text books could not generate within me the idea of the vastness and the atomity of the structures, even though their dimensions were mentioned. Names such as Moraine, Mushroom Rock, Zuegens, Taffoni and many others made me wonder how they must be in reality. Books with colourful images were rare and expensive when I was a student. My thirsty vagabond soul always yearned for seeing with my own eyes the craftsmanship of nature. But visiting each and every place was a financial challenge. In every documentary I had watched, the geographer in me and my inquisitive mind would look out for similarities and dissimilarities with the text book descriptions. In this journey Bollywood and also

Hollywood played a major role. Today through this write up I would like to present some of my findings from Hindi films while comparing them with text book descriptions. Let's begin with the all-time blockbuster *Sholay***.** In the picture on the left in the backdrop is seen a rocky elevated mass. These are Ramadevara Betta Hills situated in Karnataka. These are ***__Batholiths__***, an intrusive igneous structure. Hundreds of years of erosion, unearths this subsurface solidified magma and they stand out as ***__Monadnocks or Bornhardts/ Inselberg__***. Such features are also seen as in Ranchi, Jharkhand, Ayodhya Hilla, West Bengal.

Let me draw your attention to some recent movies. The picture on the right is from *Pukar* a film released in 2000. The song *Kismat se Tum Humko Mile* was shot in Mount Marcus Baker in Alaska, a mountain and valley ***__Glacier__***. The song shows various glacial features like ***__Cracks and Crevasses__***, the thickness of the glacial mass as it flows down to the Harvard

Arm, is a ***__Fjord__***. At such high latitude, and low altitude the massiveness of the glacier is vivid. Similar such shots are seen in the song *Rang de Mohe Gerua* from the movie *Dilwale. The location was* on the Jökulsárlón glacier in Iceland.

This song also showcases some of the exquisite landforms unique to Iceland. Iceland is formed at the junction of two divergent plates. The North American and Eurasian Plate. Situated on the Mid Atlantic Ridge

over the Icelandic Plume, Iceland exhibits several volcanic landforms. As shown in the image on the left are the ***__Columnar Hexagonal Dykes.__*** These are intrusive igneous formations. The hexagonal columns are formed as a result of a certain type of crystallisation and solidification process. In the image on the right is the Reynisfjara black sand beach formed as a result of weathering and coastal erosion process of the lava beds. The beach is part of the Katla UNESCO Global Geopark. It also shows ***__Sea Stacks,__*** known as Reynisdrangar Sea stacks. These are formed as a result

of headward erosion by sea waves, where the headlands erode to form arches, and when the roof of the arches collapse, they become sea stack, standing up like pillars. Similar such landforms will be discussed later too.

Let's take a trip back to our own mesmerising country and travel through snow covered and glaciated landscapes of India in a filmy *istyle*. Films like *Jab We Met, Highway, Jab tak Hai Jaan, 3 Idiots* and many more have captured the stunning geographical beauty through its lenses. The image on the right is from *Jab we Met* where we travel through Rhotang Pass, up in to Himachal Himalayas where we can see the ***Scree and Talus Cone*** along the way to Poh in the movie *Highway*. Scree and Talus cones are formed as a result of physical weathering, which leads to disintegration of rock materials. As these materials moves along the slope by the gravitational force they create fan like structure, at the foothills. The Scree grows bigger in size to become Talus cone. The image below takes us to Ladakh. The pristine blue waters at the confluence of Zanskar and the

Indus River is a place that should be in everyone's bucket list. We travel through the Himalayas and these location in particular with *3 Idiots*. ***The Gorges and the Canyons***, the ***Receding Glacial Valleys*** have created a breath-taking topography to behold which we can traverse through these movies.

The ***Braided Channesl*** of the Himalayan streams too have been well depicted many films. The image below is from *Highway*. One can see such an examples in movies like *Bhag Milkha Bhag*, where Farhan Akhtar trains himself with a tyre on the Shyok River bed.   *3 idiots* and *Jab tak hai Jaan* have efficiently captured the beauty of Ladakh, especially the Pangong Lake. Pangong Tso or

Pangong Lake is an ***Endorheic Water Body*** and not a glacial lake. It is believed to be a salt water body formed when the sea water of the Tethys got trapped as a result of the Indian Plate moving towards the Eurasian plate, during the formation of the Himalayas. The cold desert plateau landforms approximately 5000 meters high have been well captured in these movies.

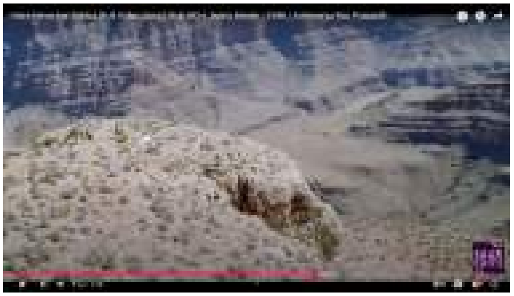

Let's get blown in the wind from the cold to the hot deserts. Here the aeolian erosional and depositional action are the most dominant. Here I have given glimpses of movies and their songs being shot. The images on the left are from the song *Hai Re Hai Re Hai Rabba* in the movie *Jeans.* Some of its scenes are located in the Grand Canyon, Colorada desert. The ***<u>Grand Canyon</u>***, is work of the Colorado river and the extreme temperature conditions of the desert eroding its way on a two-billion-year-old rock structure of Proterozoic and Palaeozoic age. The ***<u>Mesa, Butte</u>***, the ***<u>Incised Meander</u>*** and the different coloured beds of rocks are vivid in the song. It is complex geological structure with folds, faults, volcanics and karst topographic conditions. One must also watch the song *If You Hold My Hand* from the movie *ABCD 2* to have a majestic view of the Grand Canyon. The second image belongs to the Valley of Fire State Park in Nevada. The dominant rock variety of red sand stone, where shifting sand dunes date back to 150 million years. Curved out by the abrasion action of wind where sand particles act as chisels and tools making ***<u>Tafoni</u>***. The third image on the left shows ***<u>Mushroom Rock, Gaur or Gara</u>*** formed from aeolian erosion action, where a hard rock layer towers over the softer rocks., The softer rocks get eroded easily generating an umbrella like shape. The image is from a song *Sunta Hai Mera Khuda* from the movie *Pukar* shot at Geology of Arches National Park, Utah. This song shows multiple landforms as a result of wind erosion in a ***<u>Hamada</u>*** or Rocky desert. On the right is the image which belongs to the movie *Krissh 3*, the song *Dil Tu hi Bata*, shot in Jordon near Wadi-Rum, Petra and the Dead sea. Here in image we can see a ***<u>Wind Arch/ Wind Bridge</u>*** at Jebel Kharraz in the Wadi Rum desert. These wind bridges are formed when a rock structure faces abrasion action of wind from both sides such that the wall between collapses in the middle. A natural arch like structure thus gets formed.

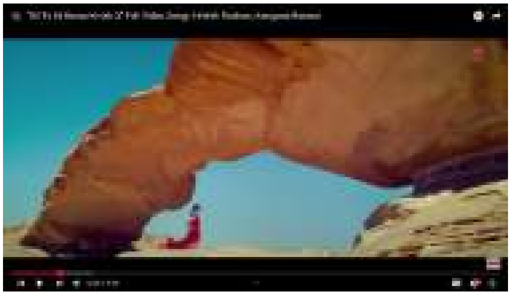

The image below belongs to the movie *Ghazni* and the song *Tu Meri Adhuri Pyas* shot in the Sossusvlei region of Namib-Naukluft National Park, located in Namib desert, along the South Atlantic Ocean coast.The ***<u>Star Shaped Dunes</u>*** and its edges have been beautifully cinematographed. The "Big Daddy" is the highest dune here. Moreover Deadvlei a ***<u>Playa Lake</u>*** is mesmerising to watch in this song. A playa lake is often known as a ***<u>Salt Pan/ Clay Pan</u>***. These

lakes was formed after heavy rainfall. The runoff flows down the surrounding hills and accumulates on the central low lying area, creating a temporary shallow pool. During dry months, the water evaporates leaving the mineral salts behind.

In the image below the pointed landforms are known as ***Demoselles***. They are formed as a result of weathering and aeolian action when the cap rock

is harder than than rest of the structure. They are also known as ***Earth Pillars, Fairy Chimneys*** or ***Hoodoos***. The song *Phir Bhi Ye Zindegi* from the movie *Dil Dhadakne Do* has been shot in Turkey in place known as Cappadocia where this image is from. Over millions of years the erosion of volcanic ash deposits have led to the formation of these pillar like structures, and the cap rock made of basalt stands with its head held high. This region is also known as Love Valley and even Monk Valley. It has beautiful caves and were even habitated. This is a part of the Göreme Historical National Park.

After being swept by the wind, lets take a dive into the rivers and then swim upto the seas. Rivers and seas have produced striking landforms that has not only attracted tourists across the world but also production designers, directors and location managers in the film industry forever. Rivers, waterfalls, seas have been extensively used as movie locations and backdrops to tell stories. Let me tell you the story of the image on the right. This is the Bedhaghat, located in Madhya Pradesh. The movie scene is from *Mohenjodaro*. It is the first scene. There have been many movies shot in this location such as the song *Raat Ka Nasha Abhi*, from *Asoka*. This is also known as Marbel Rocks and situated here is the Dhuandhar Falls. It is a spectacle to visit this place in the post monsoon months.

The River Narmada flows thorough this rift valley which is a major fault line as seen in the image. The mountains on the side have become ***Horst*** and the fault line is the ***Graben***. The rocks are predominantly of limestone and thus karst topographic features such as ***Ponor and Uvalas*** can be clearly seen here. The image on the immediate right is from the film *Bachna Ae Haseeno*, the song is *Khuda Jane*. This particular shot shows a ***Sea Cave*** and a ***Sea Stack***. In the image below is a ***Sea Arch*** from the same song. The location of this shoot is at Faraglioni in Italy.

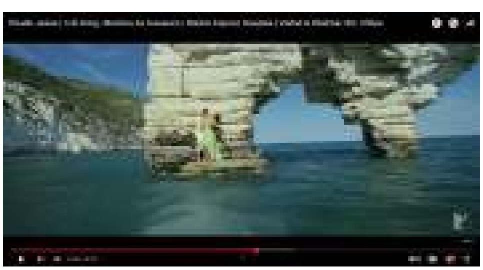

The geology is dominated by limestone, a sedimentary rock formed as a result of millions of years of marine deposition. The erosive action of the sea has curved out caves. When the cave walls collapse the arches are formed and when the ceiling of the bridge collapse the stacks are formed. The next images have salt in common. The former is from *Krissh 2* and the song is *Dil Tuhi Bata*, shot near the Dead Sea in Jordan. The Dead Sea has the highest salinity in the world. Such is its density that no one can drown in it. The large-scale

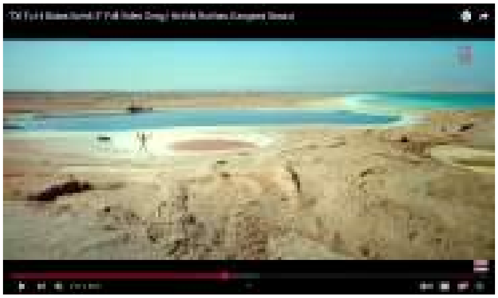

deposits of salt along the sea are known as ***Salt Giants***. They are formed as the lake's highly saline water evaporates Similarly, in the latter image from the movie *R Rajkumar* in the song *Saree ke Fall Saa*, shot in the ***Rann of Kutch*** in Gujarat, we see vast landscapes cover with salt. This white salty desert is reputed to be the largest salt desert in the world. This region was submerged under the Arabian Sea before 1890 and many rivers drained into it. Due to tectonic upliftment its now above the mean sea level. The course of the rivers got shifted westwards and the upliftment created a natural embankment named Allah Bandh which has cut off the Rann from fresh water supply. Every monsoon, submerged under water, the Rann gets connected to the Sea and receives saline water, which when evaporates creates this white desert. The salt here is a source of livelihood for many nearby dwellers. The last but not the least, is the picture from the movie *Dil Se*, the song *Jiya Jale Jaan Jale* shot in the ***Backwaters*** or ***Lagoons*** of Kerela, namely Alapuzzha. These lagoons are formed as a result of coastal sedimentation process enclosing a small part of the brackish sea waters.

There are so many more examples where films have not only mere depiction of real life, history, natural and cultural landscapes but future projections. Movies on Climate Change, Apocalypse, Hurricanes, Volcanoes, Space Odessys are also there, which helps us learn about science, disaster management, international policy implementations, global initiatives etc.   I would request students and those with keen interest in geography to watch these films with a sense of curiosity to know the world and learn while having fun.

Mona Lisa Smile and Little Women: Cinema of Choice, Change, and Quiet Courage

Meghna Roy
Assistant Professor of English

Some films do not seek to dazzle with spectacle. They don't need fast-paced action or loud declarations to make their point. Instead, they unfold slowly, allowing space for reflection—on life, on identity, and on the quiet but powerful choices that shape who we become. Mona Lisa Smile (2003), directed by Mike Newell, and Little Women (2019), directed by Greta Gerwig, are two such films. Though set in different time periods and cultural landscapes, both explore how women—especially young women—navigate the complex pressures of tradition, ambition, love, and personal freedom.

Set in the rigid social atmosphere of 1950s America, Mona Lisa Smile follows Katherine Watson (Julia Roberts), a progressive art history professor who joins Wellesley College, an elite institution for women. Coming from the more liberal West Coast, Katherine is surprised to find that her students—intelligent, articulate, and well-educated—are not encouraged to use their education for independence or professional growth. Instead, they are being trained to become perfect wives, mothers, and hostesses, upholding the conservative ideals of the time.

Katherine's initial goal is to teach them to appreciate modern art—to look beyond the surface, to think critically, and to engage with ideas outside the textbook. But as she grows more invested in her students' lives, she realizes that the real subject she's teaching is freedom—the freedom to choose one's own path, whether that means pursuing a career, building a family, or stepping into the unknown. Her classroom becomes a space for self-discovery, where questions are more important than answers.

Each student represents a different facet of the struggles women faced in the mid-20th century. Betty Warren (Kirsten Dunst) is the classic example of the "ideal" Wellesley student—stylish, smart, and fiercely traditional. She believes strongly in marriage and social roles, but her journey is one of disillusionment. As her perfect life begins to unravel, she is forced to confront the emptiness behind the expectations she had unquestioningly embraced.

Joan Brandwyn (Julia Stiles) is academically gifted and aspires to attend Yale Law School. However, she is torn between her ambition and her desire to build a loving home with her fiancé. Her decision to choose marriage is not shown as defeat, but as a personal choice—made with full awareness and on her own terms. Giselle Levy

(Maggie Gyllenhaal) is bold, free-spirited, and open about her relationships—a sharp contrast to the polite repression around her. Yet beneath her confident exterior is a longing for connection and respect, which she struggles to find in a judgmental world.

Through these young women, the film presents a spectrum of female experience. Rather than promoting a single model of empowerment, Mona Lisa Smile asks: What does it mean to live freely? Can a woman who chooses home and motherhood be just as empowered as one who chooses career and independence?

One of the most compelling aspects of Mona Lisa Smile is how it uses art not just as a subject, but as a metaphor for life. Just as Katherine teaches her students to look beyond the traditional rules of artistic beauty, she also encourages them to look beyond the roles society has laid out for them. The paintings in her classroom become windows into possibility—reminding them that meaning, like identity, is not fixed. It must be explored, interpreted, and sometimes reimagined.

While Mona Lisa Smile is set in the 1950s, Little Women travels further back to the 1860s, during the American Civil War. Yet, the themes feel remarkably similar. Greta Gerwig's adaptation of Louisa May Alcott's novel captures the heart of womanhood with stunning sensitivity. The March sisters—Jo, Meg, Amy, and Beth—are each distinct in personality and desire, yet bound by deep affection and shared struggle.

Jo March (Saoirse Ronan) is the passionate writer who wants to remain independent, rejecting the idea that marriage should define her. Her love for writing and her refusal to settle for anything less than what she truly desires makes her one of the most inspiring characters in modern cinema. Amy March (Florence Pugh), often misunderstood, reveals a more complex view of ambition. She acknowledges that marriage, in her world, is not just about love but about economic survival and social security. Her decision to marry Laurie is not a betrayal of ambition but an act of conscious, strategic choice.

Meg embraces domestic life, while Beth, the gentlest of them all, lives quietly and lovingly, leaving behind a legacy not through success, but through kindness and music. These characters, like the students of Wellesley, show us that there is no single path to strength or fulfillment. Whether one chooses family, career, art, or solitude, what matters is that the choice is made with awareness and intention.

Both films remain deeply relevant today. As students, many of us are navigating pressures—academic performance, career expectations, relationships, and societal norms. There is still an unspoken tension between what we feel and what is expected. In such a world, these films offer not just stories, but guidance. They remind us that it's okay to pause, reflect, and walk a different path if that is what feels right. They

encourage us to trust our instincts, value our individuality, and respect the choices of others.

Mona Lisa Smile and Little Women are not just about women in history—they are about all of us who are in the process of becoming. They portray the quiet courage it takes to ask, What do I want? They show how education, art, and literature can serve as tools of self-discovery. And most of all, they remind us that choosing your own way—whatever that looks like—is an act of strength. In an age when life moves fast and expectations run high, these films bring us back to a simple but powerful truth: that to live meaningfully is not to follow a perfect plan, but to make choices that feel true to who we are.

বর্তমান যুগ-সমাজে আধ্যাত্মিকতার প্রাসঙ্গিকতা

ডঃ শিল্পী বক্সী
শিক্ষিকা, বাংলা বিভাগ

যুগবিভাগের মানচিত্র প্রদক্ষিণ করলে আমরা দেখতে পাই—বর্তমান কালাবধি যুগের চারটি প্রকার নির্মিত হয়েছে। প্রথম- সত্যযুগ, দ্বিতীয়- ত্রেতা যুগ, তৃতীয়- দ্বাপর যুগ এবং চতুর্থ তথা অন্তিম- কলি যুগ। বর্তমান যুগাবস্থা কলি যুগেরই অন্তর্ভুক্ত। সর্বযুগেরই ধারক-বাহক রূপে পরম ঈশ্বর শ্রীবিষ্ণুদেবকে মান্য করা হয়। শ্রীবিষ্ণুদেব মানবের পরিত্রাণের জন্য প্রতি যুগেই নানান বেশে তাঁর অংশকে নানান অবতার রূপে এই মর্ত্যধামে প্রেরণ করেছেন।

মনুষ্যকুলের সহজাত প্রবৃত্তিই হল— কাম- ক্রোধ- লোভ- মোহ- মদ- মাৎসর্য্যাদি রূপ ষড় রিপুর প্রতি আকর্ষণ। মনুষ্যকুলকে এই রিপু সমূহের কবল থেকে মুক্ত করতেই এই ভূ-লোকে ঈশ্বরের অবতার রূপে আগমন ঘটে। মানবকুলের মধ্যে উচ্চ প্রবৃত্তিসমূহের জাগরণ ঘটিয়ে ধর্ম সংস্থাপনার মধ্য দিয়ে যুগকে রক্ষা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাইতো বিভিন্ন যুগে ঈশ্বর কখনও মনুষ্য-পশুর মিলিত রূপ তথা 'নরসিংহ' চেহারায়, কখনও পরশুরামের বেশে, কখনও ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রূপে, কখনও শ্রীকৃষ্ণের বেশে, আবার কখনওবা মানবরূপী ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব রূপে ভূ-লোকে দর্শন দিয়েছেন। এই কলি যুগেই ধরাধামে তথা আমাদের এবঙ্গেরই নবদ্বীপধামে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দে (আনুঃ) মানব রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ আমাদের কাছে যে কতখানি পরম সৌভাগ্যের বিষয়— তা শব্দবন্ধনে প্রকাশ করতে চাওয়া মূঢ়তা; তা ব্যক্ত করতে গেলে হৃদয় বিগলিত আনন্দাশ্রু নির্ঝরিণীর আকার ধারণ করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার মিলিত অবতার রূপে শ্রীচৈতন্যদেব এই কলি যুগেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মনে করা হয়—তিনি 'অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃগৌর'। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভাবকে অন্তরে ধারণ করে আর বাহ্যিক চেহারায় শ্রীরাধিকার ভাবে ভাবিত হয়ে এক 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ' রূপেই পুণ্যভূমি নবদ্বীপ-মায়াপুরধামে তাঁর আবির্ভাব। আধ্যাত্মিকতা রূপ পরশমণি মানবসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে মনুষ্যকুলকে অচৈতন্যের অন্ধকার জগৎ থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসে সকলের মধ্যে চৈতন্যের জাগরণ ঘটাতে চাওয়া এই মহামানব 'মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব' নাম প্রাপ্ত হন এবং তিনি হয়ে ওঠেন মানবতার পূজারী।

আবার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শে ধন্য ষড় গোস্বামীকে চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালে পতিতপাবন রূপে মানবকুলের উদ্ধার রূপ মহৎ কার্যে জীবনকে উৎসর্গ করে দিতে দেখা যায়। আরও পরে আগত শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, মা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই পথেরই পথিক। কিন্তু কলি যুগে এইসব মহামানবদের পরবর্তী সময়ে যথার্থ আধ্যাত্মিকতার মার্গে চ'লে মানবকুলের উদ্ধার হেতু তাদেরকে শ্রীকৃষ্ণের কথামৃত তথা শ্রীমদ্ভাগবতগীতার পাঠ দ্বারা, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন দর্শনের শিক্ষা দ্বারা এই মানবজীবন যাপনের সঠিক পথ নির্দেশনার উদ্দেশ্যে খুব কমই প্রকৃত আধ্যাত্মিক মানবের আবির্ভাব ঘটতে দেখা গেছে। আর সেজন্যই হয়তো বর্তমান যুগ-মানবের দিনে দিনে নৈতিকতার অধঃপতন ঘটে চলেছে। বর্তমান মানবকুলের একটা বৃহৎ অংশ যেন আজ এক অন্ধকার পঙ্কময় আবদ্ধ জলাশয়ে নিজেদেরকে স্বেচ্ছায় অবগাহিত করে দিচ্ছে। ষড় রিপু মানব সমাজকে গ্রাস করে ফেলছে। নির্ভয়ে মানুষ একের পর এক পাপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। মানুষে মানুষে হানাহানি- খুন- জখম- হত্যা- ধর্ষণ, চরিত্রশৈথিল্য- নেশাসক্তি- জুয়োবাজি- প্রতারণা– মিথ্যাচার- কটূক্তি- দুর্ব্যবহার প্রভৃতি দুষ্কর্মসমূহে বর্তমান সমাজ আজ লিপ্ত। আসলে এর কারণ হল— মানবসমাজের একটা বৃহদাংশ জুড়ে আজ প্রকৃত শিক্ষা আর প্রকৃত ধর্মবোধের বড়োই

অভাব। শিক্ষা জগতের এক অধঃপতিত রূপ দেখে বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'পথের দিশা' কবিতায় তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠে তাই একদা ধ্বনিত হয়েছিল-

"মাতালদের ঐ ভাঁটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি!"

অন্যদিকে, ধর্মের বিকৃত রূপ দেখে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন—

"মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার"

আসলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বর্তমান কালের তথাকথিত আধুনিক মানুষ ধর্মের প্রকৃত অর্থই আজ বুঝতে যেন অসমর্থ। তাই তার সদর্থক প্রয়োগ করতে না পেরে তার নঙ্গর্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে সমাজে এক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাই তাঁর 'ধর্মমোহ' কবিতায় একথা উচ্চারণ করেছেন—"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে/ অন্ধ সে-জন মারে আর শুধু মরে"।

আসলে পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত আজকের বেশিরভাগ মানুষ তথাকথিত উন্নতিপত্রে ছাপা এক সংখ্যা অর্জনের প্রতিই বর্তমানে অধিক মনোযোগী; প্রকৃত জ্ঞানার্জনের প্রতি নয়। অন্যকে নিচে ফেলে নিজেকে এক নিরর্থক উচ্চতায় ওঠাতে তথা এক ব্যর্থ ফলের আশায় আজকে মানুষ অধিক সময় ব্যয় করে। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ তাদের কাছে অচেনা। আসলে এর কারণই হল— বর্তমান সমাজের লক্ষ্যভ্রষ্ট- দিগ্‌ভ্রান্ত তথাকথিত আধুনিক মনুষ্যকুলের জন্য প্রকৃত জ্ঞানী সঠিক পথপ্রদর্শকের অভাব, তথা যুগ পরিচালকের অভাব, তথা মানবকুলের উদ্ধার হেতু আগত প্রকৃত যুগ-পুরুষের অভাব। এই বর্তমান যুগসমাজে প্রকৃত ধর্ম জ্ঞানসম্পন্ন, সমাজের দিক- নির্দেশকরূপী মহামানবের দেখা মেলা হয়তো আজ সত্যিই দুষ্কর। কিন্তু, যে জ্ঞানের খনি আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ সমূহে খোদিত হয়ে রয়েছে—তা যদি বাক্সবন্দি করে না রেখে আজকের মানবসমাজ যথার্থভাবে অধ্যয়ন করে এবং তা থেকে প্রকৃত পাঠ নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে চলে— তাহলে মানবসমাজ আবার নূতন এক সুবর্ণ যুগ রচনা করবে।

'ধৃ' ধাতু থেকে আগত 'ধর্ম' শব্দের প্রকৃত অর্থই হল—'ধারণ করা' বা 'যা ধারণ করে'। অর্থাৎ যে বিশ্বাসব্যবস্থা, যে জীবনদর্শন, যে আচরণবিধি অনুসরণ করে জীব তার জীবনকে পরিচালিত করে, তা-ই হল 'ধর্ম'। অর্থাৎ, জীবনের মূল অবলম্বনই হল 'ধর্ম'। আর 'আধ্যাত্মিকতা' হল সেই মার্গ বা পথ—যা জীবকে তার প্রকৃত স্বরূপকে চিনিয়ে দেয়, বৃহত্তর সত্তার সাথে তার সংযোগ স্থাপন ক'রে তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাকে অবহিত করে। আসলে 'আধ্যাত্মিকতা' যেন আত্ম-আবিষ্কারের একটি মার্গ বিশেষ। জীবনের গভীর অর্থ এবং উদ্দেশ্যকে এই মার্গ দ্বারাই অনুসন্ধান করা সম্ভব। তাই আধ্যাত্মিকতার মার্গ জীবকে তার জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতাসমূহকে এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বুঝতে শেখায় এবং জীবের মধ্যে এক অদ্ভুত সুখকর পরম শান্তিময় অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়ে তার মধ্যে এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে বর্তমান যুগসমাজকে অন্ধকার জগৎ থেকে দূরে থাকতে প্রকৃত ধর্মজ্ঞান আর প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার সঠিকভাবে পাঠ নেওয়া প্রয়োজন। আর এ বিষয়ে আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহ যেমন- বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন চৈতন্যজীবনী গ্রন্থসমূহ যেন পরশমণি স্বরূপ।

কথিত আছে—'যা নেই ভারতে, তা নেই মহাভারতে'। অর্থাৎ, 'মহাভারত'-এ যা নেই, তা সমগ্র ভারতেও নেই। তাই, এক 'মহাভারত' গ্রন্থটি পাঠেই মানবসমাজের সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হতে পারে। জীবনের প্রকৃত শিক্ষার সমস্ত পাঠ মেলে এই 'মহাভারত' গ্রন্থটি থেকে। যেমন- অধর্ম যত বৃহৎই হোক না কেন, তার পতন যে নিশ্চিত— বৃহৎ কৌরব বাহিনির পরাজয়ের কাহিনিতে সেই শিক্ষাই লব্ধ হয়। অন্যদিকে, যেখানে ধর্মের সংস্থাপনার আয়োজন, তথা যাঁরা প্রকৃত ধর্মের পথে চলেন, স্বয়ং ঈশ্বর যে তাঁদের সহায় হন-- পাণ্ডবকুলের পথ-নির্দেশক রূপে, এমনকি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুনের রথের সারথি রূপে ভূমিকা

পালন করতে দেখে এ শিক্ষাই মেলে। আবার, মহাকাব্য 'রামায়ণ'-এ রাবণ চরিত্রটি অত্যধিক পরাক্রমশালী– বলবান– প্রাচুর্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার চরিত্রস্খলন, দুরাচার, প্রতিহিংসা পরায়ণতা আর দম্ভের কারণেই তাকে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যেতেও দেখা যায়।

একথা একেবারেই সত্য যে, অন্যায়কারী- অধার্মিক ব্যক্তির মন সর্বদা অস্থির- চঞ্চল থাকে; অন্যদিকে, প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা স্থির- অবিচলিত চিত্তে অবস্থান করেন। কখনও কখনও অধার্মিকের আপাত জয় লক্ষিত হলেও পরিণতিতে তার ঘোর পরাজয় সুনিশ্চিত। অন্যদিকে, প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির জীবনে সাময়িক কষ্ট প্রাপ্তি ঘটলেও অন্তিমে যে তিনিই প্রকৃতপক্ষে বিজয়ী হন বা সকল সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় সিংহাসনে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন— 'রামায়ণ'-এর রাবণ ও রাম চরিত্রের তুলনামূলক বিচারে উক্ত জ্ঞান লব্ধ হয়।

জীবনে প্রকৃত ধর্মের মার্গে চলার বিষয়ে নানান জ্ঞান-ভাণ্ডার 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'-র আঠারোটি অধ্যায়ে তার মধ্যে থাকা সাত শত শ্লোকের মধ্যে মেলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেখান হতে কতকগুলি শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা সূত্রে বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। সেখানে আমরা দেখি-- পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যেন অর্জুনকে মাধ্যম করে সমগ্র মানব সমাজকে সর্বদা প্রকৃত ধর্মের পথে চলারই বার্তা দিতে চেয়েছেন। মানুষ যেন সর্বদা স্মরণে রেখে চলে যে, পরমেশ্বর অলক্ষ্যে অবস্থান করে সর্বদাই মনুষ্যের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ করছেন। তাই পাপ-পুণ্যের বোধ যেন মানুষের অন্তর থেকে উবে না যায়। পাপাত্মাকে চরমতম দণ্ড বিধানকারী আর পুণ্যাত্মার সহায়ক তিনিই। পাপ-পুণ্যের ফলাফলের চিন্তা মানুষের মন থেকে মুছে যাচ্ছে বলেই তো মানুষ আজ নির্বিকারে একের পর এক অন্যায়কর্ম করে চলেছে। ইহকাল – পরকালের বোধ অন্তরে কাজ করলে মানুষ অন্যায়কর্মে লিপ্ত হতে খানিকটা হলেও ভীত হয়। আর সেই ভীতিবোধই তাকে উক্ত কর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে এবং তাকে এক সংযত জীবন উপহার দিতে পারে। আমাদের প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থগুলি পাঠে মানুষের মনের অশুচিতা দূরীভূত হয়; হৃদয় পবিত্র হয়। ফলে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার মার্গই বর্তমান সমাজকে এক পবিত্র ভূমিতে পরিণত করতে সহায়ক।

'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'-র দ্বাদশ অধ্যায় তথা 'ভক্তিযোগ'-এ শ্রীকৃষ্ণের বাণী—

"অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।।১৩।।
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৪।।"

অর্থাৎ, যিনি সমস্ত প্রকার জীবের প্রতি হিংসা- দ্বেষশূন্য, সবার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন, কৃপালু, নিরহংকার, সুখ- দুঃখ দুই অবস্থাতেই সমভাবাপন্ন, সর্বদা ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, সদা ভক্তিযোগে যুক্ত, যাঁর স্বভাব সংযত, দৃঢ় সংকল্পযুক্ত এবং যাঁর মন ও বুদ্ধি সর্বদাই তাঁহাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে অর্পিত—সেইরূপ প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি ঈশ্বরের খুবই প্রিয়। অর্থাৎ, এই প্রকার সৎ বুদ্ধি সম্পন্ন মনুষ্যই পরমেশ্বরের কৃপাধন্য হন।

আবার, 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'-র দ্বিতীয় অধ্যায় তথা 'সাংখ্য যোগ-এ লিখিত রয়েছে—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্‌পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে।।৬২।।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।৬৩।।"

অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধিত চিন্তা করতে করতে মানুষের তাতে আসক্তি জন্ম নেয়। আর আসক্তি থেকেই কাম জন্ম নেয়। কামের থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি ঘটে। ক্রোধের থেকে আসে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে

আসে স্মৃতিবিভ্রম, আর স্মৃতিবিভ্রম থেকে হয় বুদ্ধিনাশ। আর বুদ্ধিনাশই ডেকে নিয়ে আসে সর্বনাশ। অর্থাৎ, মনুষ্য পুনরায় জড় জগতের অন্ধকূপেই অধঃপতিত হয়।

'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'-য় এ-ও কথিত রয়েছে যে, বিষয়কামী ব্যক্তি কখনই প্রকৃত শান্তি লাভ করে না। সন্তুষ্টিই মানুষের মনে শান্তি প্রদান করে। কিন্তু, আজকের মানুষ এইসব আধ্যাত্মিক পরম জ্ঞান লাভ করতে না পারায় তারা সদাই অসন্তোষে ভোগে আর সন্তোষ লাভের ব্যর্থ আশায় নানান কু-কর্মে লিপ্ত হয়ে পুনরায় অসন্তোষের অন্ধকূপেই পতিত হয়। আবার, যে নিষ্কাম কর্মের উপদেশ 'গীতা' আমাদের দেয়—তা হতে কখনই আমাদের জীবনে দুঃখ প্রাপ্তি ঘটে না। কিন্তু সেই আদর্শ যেন আজ কোথায় বিলীন হয়ে গেছে! সর্বদা ভোগবাসনা- বিষয়াসক্তিতেই মশগুল হয়ে থাকতে চায় আজকের মানুষ। অথচ তারা পরিণতিতে কেবলই শূন্যতা- হাহাকার আর অশান্তিই লাভ করে। উক্ত মহাগ্রন্থেরই ষোড়শ অধ্যায় তথা 'দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ'-এ এই জগৎ সংসারে দৈব আর আসুরিক –এই দুই প্রকার জীব সৃষ্টির কথা মেলে। আজকালকার মানুষ দৈব প্রবৃত্তিকে গ্রহণ করতে অসামর্থ হয়ে যেন আসুরিক প্রবৃত্তির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে। এর ফলস্বরূপ মানবসমাজ যেন এক আসুরিক সমাজের রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে।

তাই তো আজকের মনুষ্যকুল প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী 'কাম' শক্তিকে আশ্রয় করে দম্ভে মদমত্ত হয়ে মোহের বশবর্তী হয়ে নানান অশূচি কর্মে ব্রতী হচ্ছে। অপরিমেয় দুশ্চিন্তাকে আশ্রয় করে মৃত্যু কালাবধি ইন্দ্রিয় সুখ ভোগকেই তারা নিজেদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করছে। ষড় রিপু তাদেরকে নাগপাশে বেঁধে ফেলছে। অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জনে ব্রতী হয়ে বহুবিধ অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয়ে আজ অধিকাংশ মানুষ সুখ সন্ধান করে চলেছে। অথচ, সুখের জন্য কেঁদেও তাদের কপালে সুখ জোটেনা। বরং তারা গভীর থেকে গভীরতর এক অন্ধকার জগতের কারাগারে বন্দি হয়ে পড়ছে। তাই আধুনিক কালের কবি কামিনী রায়ও তাঁর 'সুখ' কবিতায় লিখেছেন—

" 'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদ না আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে
ততই বড়িবে হৃদয় ভার।"

'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'-র ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাই মনুষ্যকুলকে উপদেশ দিয়েছেন--

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।।২১।।"

অর্থাৎ, কাম- ক্রোধ ও লোভ— এই তিনটি হল নরকের দ্বার। এই তিনকে মানুষের সর্বপ্রথম পরিত্যাগ করা উচিত। আর তবেই মানুষের জীবনে পরম শান্তি বিরাজমান থাকবে। আজকালকার দিনে এই শান্তিরই তো সবচেয়ে বেশি অভাব। আর এই নরকের দ্বারসমূহকে রুদ্ধ করতে পারলে জগৎ থেকেও নানান পাপাচার দূরীভূত করা সম্ভবপর হবে।

এর জন্য প্রয়োজন—প্রকৃত ধর্মজ্ঞান লাভ করে আধ্যাত্মিকতার মার্গ অবলম্বন। এই আধ্যাত্মিকতার মার্গকে চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে সৎ চরিত্র গঠনের দ্বারা মানবসমাজ সমস্ত প্রকার বিষয়ে প্রকৃত সাফল্যের জগতে প্রবেশ করতে পারে; প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারে। বিষয়টি 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'-র দ্বিতীয় অধ্যায়ের এক শ্লোকে সম্যকভাবে ব্যক্ত রয়েছে—

" নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।৬৬।।"

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কৃষ্ণ ভাবনায় তথা ঈশ্বর ভাবনায় যুক্ত নয়, তার চিত্ত কখনই সংযত নয় এবং তার

পারমার্থিক বুদ্ধি থাকতেই পারে না। আর পরমার্থ চিন্তাশূন্য ব্যক্তির শান্তি লাভের কোনো সম্ভাবনাই নেই। হায়! এ ধরণের শান্তিহীন ব্যক্তির প্রকৃত সুখ কোথায়!!

রাধা-কৃষ্ণের যুগলাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকেন্দ্রিক আধ্যাত্ম রসসিঞ্চিত মাহামূল্যবান গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'-তেও বহু জ্ঞানরাশি পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে— যা মানুষের প্রকৃত জ্ঞানচক্ষুর উন্মোচন করতে পারে। যেমন- আজকের মানুষ 'কাম' ও 'প্রেম'-এর ভেদই ভুলে গেছে। তাদের কাছে 'কাম' ও 'প্রেম' যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই আজ চতুর্দিকে প্রেমের এক বিকৃত রূপ লক্ষিত হচ্ছে। অথচ উক্ত মহাগ্রন্থে এ বিষয়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে—

" 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' তারে বলি কাম;
'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' ধরে প্রেম নাম।"

অর্থাৎ, আত্ম ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সম্পাদনের ইচ্ছাকে বলে 'কাম'। অন্যদিকে, কৃষ্ণের, তথা প্রাণের মানুষটির প্রীতি সম্পাদনার্থে আত্মোৎসর্গের নামই হল 'প্রেম'। 'প্রেম' সম্বন্ধীয় এই বোধ আজকালকার মনুষ্যের মধ্যে আজ কোথায়!!

সুপ্রাচীন কাল হতে প্রবহমান আধ্যাত্মিকতার মার্গকে ভুলে এক তথাকথিত অতি-আধুনিকতার রাস্তা তৈরি করে নিয়ে সেই পিচ্ছিল পথে চলতে গিয়ে মানুষ সদাই এখানে পা পিছলে পড়ছে। ফলে জীবনের যাত্রাপথে সদাই তারা পরাজয় লাভ করছে আর সবশেষে এক ব্যর্থ- কলুষিত- নগ্ন- বিকৃত মানব জীবন লাভ করছে। তাই আজকের দিনে বর্তমান যুগ-সমাজকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে তাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্মজ্ঞানের বীজ রোপন করতে হবে। কেবলই কর্ম নয়, ধর্মসঙ্গত কর্মের পথে মানুষকে প্রেরিত করতে হবে। অর্থাৎ প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার মার্গই মনুষ্যকুলের উদ্ধার কার্যে একমাত্র সহায়ক।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সংস্কৃত ভাষা ও তার প্রাসঙ্গিকতা

অমিত মান্না

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

সূচনাপর্ব :- স্বামী বিবেকানন্দ, ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ও বিংশ শতকের সূচনালগ্নে ভারতীয় দর্শন ও চেতনার অন্যতম প্রধান প্রচারক হিসেবে বিশ্বমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে যুগদ্রষ্টা, আধ্যাত্মিক মনীষী, মানবতাবাদী সমাজসংস্কারক এবং এক অসাধারণ বাগ্মী। তাঁর চিন্তা ও কার্যকলাপে যেমন ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীতের প্রতিফলন পাওয়া যায়, তেমনি একটি উন্নত ভবিষ্যতের পথরেখাও নির্মিত হয়। এই ভবিষ্যতের নির্মাণে যেসব উপাদান ছিল অপরিহার্য, তার মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ছিল অন্যতম। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন, সংস্কৃত কেবলমাত্র একটি প্রাচীন ভাষা নয়, বরং তা ভারতীয় জাতির আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের আধার।

স্বামী বিবেকানন্দ : সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও দর্শনের মূল দিক :- ১৮৬৩ সালে কলকাতায় জন্ম নেওয়া নরেন্দ্রনাথ দত্ত পরবর্তীতে স্বামী বিবেকানন্দ রূপে সমগ্র বিশ্বে পরিচিত হন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য হিসেবে তিনি ঈশ্বরের সর্বত্রতা, ধর্মের সার্বজনীনতা এবং আত্মজাগরণের বাণী প্রচার করেন। তাঁর দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানবজাতির সার্বিক উন্নয়ন — আত্মিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তার অতীত ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে একটি নতুন যুগের নির্মাণের উপর। এই ঐতিহ্যের মূলভিত্তি সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে নিহিত।

সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্য ও তাৎপর্য :- সংস্কৃত, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম ভাষাগুলোর অন্যতম, বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, মহাকাব্য, দর্শন — সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডারই মূলত সংস্কৃতে রচিত। এই ভাষা কেবল একটি যোগাযোগমাধ্যম নয়, বরং একটি বিশিষ্ট চিন্তাপদ্ধতির বাহক। এর মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে ভারতের আত্মিক ধারা, যা বিশ্বব্যাপী ভারতীয় দর্শনের স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ একাধিকবার উল্লেখ করেছেন যে, সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে ভারত তার নিজস্ব পরিচয় লাভ করেছে এবং এই ভাষাই ভারতীয় সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। তিনি বলেছেন – "ভারতে 'সংস্কৃতভাষা' ও 'মর্যাদা' সমার্থক। সংস্কৃতভাষায় জ্ঞান লাভ হইলে কেহই তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না। ইহাই একমাত্র রহস্য - এই পথ অবলম্বন কর।"

স্বামী বিবেকানন্দের সংস্কৃত চর্চা ও বক্তব্যসমূহ :- স্বামীজীর নিজের সংস্কৃত ভাষার উপর দখল ছিল অত্যন্ত গভীর। তিনি প্রায়ই সংস্কৃতের বিভিন্ন শ্লোক, উপনিষদের উদ্ধৃতি ও বেদান্ত সূত্র উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তৃতা ও লেখাকে সমৃদ্ধ করতেন। তিনি মনে করতেন, ভারতীয় শিক্ষায় সংস্কৃতের অনুপস্থিতি জাতির আত্মচেতনাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তাঁর মতে, সংস্কৃত ভাষা আত্মিক জ্ঞানের প্রধান বাহক এবং এই ভাষার জ্ঞানচর্চা মানেই ভারতীয় সভ্যতার মূল স্রোতে ফিরে যাওয়া এবং নিজেকে উপলব্ধি করা।

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর মতামত :- স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা শুধু চাকরি পাওয়ার উপায় নয়, বরং আত্মোন্নয়নের মাধ্যম। তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিলেন, কারণ সেটি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাষাকে উপেক্ষা করেছিল। তিনি জোর দিয়ে

বলতেন, শিক্ষার কেন্দ্রে থাকতে হবে সংস্কৃত, যার মাধ্যমে ভারতের গৌরবময় অতীতের সঙ্গে নতুন প্রজন্ম পরিচিত হতে পারবে। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষা হতে হবে এমন যা চরিত্র গঠন করে, নৈতিক শক্তি দেয়, এবং আত্মবিশ্বাস জাগায়। তাঁর মতে, সংস্কৃত ভাষার চর্চা এই শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।

<u>আধ্যাত্মিকতা, দর্শন ও সংস্কৃত ভাষার সংযোগ</u> :- স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনের গভীরতা কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব। বেদান্ত, যোগ, ন্যায়, সাংখ্য, বৌদ্ধ দর্শন — সকল ক্ষেত্রেই সংস্কৃত ভাষা যুক্তিবাদী, বিশ্লেষণধর্মী ও অভিজ্ঞতামূলক চিন্তার মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তিনি পশ্চিমের দর্শনের সঙ্গে তুলনা করে বলতেন, ভারতীয় দর্শন আরও গভীর ও অন্তর্মুখী এবং তার মূলে আছে সংস্কৃত ভাষার শক্তি।

<u>জাতীয় চেতনা ও সাংস্কৃতিক ঐক্যে সংস্কৃতের ভূমিকা</u> :- বিবেকানন্দ মনে করতেন, সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতিকে একটি সুতোর বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। তিনি বলতেন, সংস্কৃত এমন একটি ভাষা যা দেশের প্রত্যেক কোণ থেকে মানুষকে একটি অভিন্ন ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে। এই ঐক্যবোধই ছিল তাঁর জাতীয়তাবাদের মূলে।

<u>আধুনিক যুগে স্বামীজীর ভাবনায় সংস্কৃতের প্রাসঙ্গিকতা</u> :- আজকের যুগে প্রযুক্তির বিস্তার, তথ্যের গতি এবং বিশ্বায়নের যুগে অনেকেই সংস্কৃত ভাষাকে 'অপ্রাসঙ্গিক' বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এ সংস্কৃতের ব্যাকরণগত গঠন অত্যন্ত উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে। NASA-র গবেষণাতেও সংস্কৃতের সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই সম্ভাবনাকে শতাব্দী আগে আগাম উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে, সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন মানেই আত্মবিশ্বাসী, জ্ঞানমনস্ক ও ঐতিহ্যনিষ্ঠ ভারতের পুনর্নির্মাণ।

<u>আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত : স্বামীজির দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মূল্যায়ন</u> :- বর্তমানে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত একটি ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে শেখানো হয়, কিন্তু তা অনেকাংশে নামমাত্র। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, সংস্কৃতকে শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত না করলে ছাত্রছাত্রীরা ভারতের মূল আত্মিক ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত হবে। তাঁর চিন্তার ভিত্তিতে বলা যায়, প্রাথমিক স্তর থেকেই সংস্কৃত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত — কেবল ভাষা শেখার উদ্দেশ্যে নয়, বরং আত্মবিকাশ, নৈতিকতা ও চিন্তাশক্তির বিকাশের জন্য। তিনি বলেছেন প্রতিটি যুবক যুবতীর উচিত কঠোপনিষদের নচিকেতার মত আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস লাভ করা। তিনি বলেছেন – "কঠোপনিষদের সেই মহাবাক্যটি মনে পড়িতেছে- 'শ্রদ্ধা' বা অপূর্ব বিশ্বাস। নচিকেতার জীবনে শ্রদ্ধার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'শ্রদ্ধা' বা যথার্থ বিশ্বাস প্রচার করাই আমার জীবনব্রত। আমি তোমাদিগকে আবার বলিতেছি যে, এই বিশ্বাস সমগ্র মানবজাতির জীবনের এবং সকল ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রথমতঃ নিজের প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হও। জানিও, একজন ক্ষুদ্র বুদ্বুদ-মাত্র বিবেচিত হইতে পারে এবং অপরে পর্বততুল্য বৃহৎ তরঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু উভয়েরই পশ্চাতে অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে। অতএব সকলেরই আশা আছে, সকলেরই জন্য মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত, সকলেই শীঘ্র বা বিলম্বে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। ইহাই আমাদের প্রথম কর্তব্য। অনন্ত আশা হইতে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার উৎপত্তি হয়। যদি সেই বিশ্বাস আমাদের ভিতরে আবির্ভূত হয়, তবে উহা আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যাস ও অর্জুনের যুগ লইয়া আসিবে, যে-যুগে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকর উচ্চ মতবাদসমূহ প্রচারিত হইয়াছিল। আজকাল আমরা অন্তর্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় অনেক পিছনে পড়িয়া গিয়াছি, কিন্তু এখনও ভারতে যথেষ্ট আধ্যাত্মিকতা

আছে, এত অধিক আছে যে, আধ্যাত্মিক মহত্ত্বই ভারতকে জগতের বর্তমান জাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি করিয়াছে। যদি জাতীয় ঐতিহ্য ও আশার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তবে সেই গৌরবময় দিনগুলি আমাদের আবার ফিরিয়া আসিবে, আর উহা তোমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমরা ধনী ও বড় লোকের মুখ চাহিয়া থাকিও না; দরিদ্রেরাই পৃথিবীতে চিরকাল মহৎ ও বিরাট কার্যসমূহ সাধন করিয়াছে। হে দরিদ্র বঙ্গবাসিগণ, ওঠ, তোমরা সব করিতে পার, আর তোমাদিগকে সব করিতেই হইবে। যদিও তোমরা দরিদ্র, তথাপি অনেকে তোমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। দৃঢ়চিত্ত হও; সর্বোপরি পবিত্র ও সম্পূর্ণ অকপট হও; বিশ্বাস কর যে, তোমাদের ভবিষ্যৎ অতি গৌরবময়। বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদের দ্বারাই ভারতের উদ্ধার সাধিত হইবে। ইহা তোমরা বিশ্বাস কর বা না কর, বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও। মনে করিও না - আজ বা কালই উহা হইয়া যাইবে। আমি যেমন আমার দেহ ও আমার আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, সেইরূপ দৃঢ়ভাবে উহাও বিশ্বাস করিয়া থাকি। সেইজন্য হে বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদের প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট। তোমাদের টাকাকড়ি নাই; তোমাদেরই উপর ইহা নির্ভর করিতেছে; যেহেতু তোমরা দরিদ্র, সেইজন্যই তোমরা কাজ করিবে। যেহেতু তোমাদের কিছুই নাই, সেহেতু তোমরা অকপট হইবে। অকপট বলিয়াই তোমরা সর্বত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইবে। এ-কথাই আমি তোমাদিগকে এইমাত্র বলিতেছিলাম। আবার তোমাদিগের নিকট উল্লেখ করিতেছি- ইহাই তোমাদের জীবনব্রত, ইহাই আমার জীবনব্রত। তোমরা যে দার্শনিক মতই অবলম্বন কর না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি শুধু এখানে প্রমাণ করিতে চাই, সমগ্র ভারতে 'মানবজাতির পূর্ণতায় অনন্ত বিশ্বাস-রূপ প্রেমসূত্র' ওতপ্রোতভাবে বর্তমান, আর আমি স্বয়ং ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকি; ঐ বিশ্বাস সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হউক।"

উপসংহার :- স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সংস্কৃত ভাষা ছিল জাতির আত্মার প্রতিচ্ছবি। তাঁর চিন্তা অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই, সংস্কৃত কেবল অতীতের ভাষা নয় — তা ভবিষ্যতের দিশারিও। আজকের দিনে যখন ভারত একদিকে আধুনিকতা ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে তাকে তার ঐতিহ্যকেও ধারণ করতে হবে। এই দুইয়ের মিলন সম্ভব শুধুমাত্র যদি আমরা সংস্কৃত ভাষাকে আবারও আমাদের চিন্তা ও চর্চার কেন্দ্রে স্থাপন করি - এই ভাবনাই হোক আমাদের আগামী প্রজন্মের পথদিশা।।

ভূগোল : বর্তমান প্রয়োগ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জাহাঙ্গীর হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

ভূগোল শব্দটি অনেকের কাছেই এখনো মানচিত্র, পাহাড়, নদী বা দেশের সীমানা বোঝার মাধ্যম হিসেবে পরিচিত। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে ভূগোল তার গণ্ডি পেরিয়ে বহুমাত্রিক বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে। এটি কেবলমাত্র পৃথিবীর গঠন বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নয়, বরং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, পরিবেশগত সংকট, নগরায়ণ, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আধুনিক ভূগোল একটি প্রায়োগিক ও বিশ্লেষণমূলক বিদ্যা, যার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়া ও সামাজিক পরিবর্তন বোঝা এবং পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত বিপর্যয় মোকাবিলায় ভূগোল একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বরফ গলন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, খরা, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো সংকটের পূর্বাভাস ও বিশ্লেষণে ভূগোলের ভৌত ও প্রযুক্তিনির্ভর শাখাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। রিমোট সেন্সিং ও জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীর পৃষ্ঠতলের পরিবর্তন, বনাঞ্চল ধ্বংস কিংবা নদীভাঙনের মতো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া নিয়মিত নজরদারির আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে জাতিসংঘের IPCC প্রতিবেদনেও ভূগোলবিদদের গবেষণার উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে, যা প্রমাণ করে এই শাস্ত্রের ব্যবহারিক গুরুত্ব।

ভূগোল আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধ্বস, সুনামি বা খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্কতা, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরিতে ভূগোল অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ভারতের মতো দেশ, যেখানে প্রায় প্রতি বছরই কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে, সেখানে জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (NDMA), ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (IMD) এবং ISRO ভূগোলভিত্তিক প্রযুক্তির সাহায্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ভূগোল আজ তথ্যের বিজ্ঞান—যেখানে মহাকাশ থেকে প্রাপ্ত স্যাটেলাইট চিত্র, স্থানিক বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হচ্ছে বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে।

নগর ও পরিবহন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও ভূগোলের ভূমিকা দিন দিন বেড়ে চলেছে। Smart City Mission, AMRUT বা Gati Shakti মতো প্রকল্পগুলিতে ভূগোলভিত্তিক পরিকল্পনা অপরিহার্য। শহরের জনঘনত্ব, পরিবেশ দূষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানীয়জল সরবরাহ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা এমনকি মেট্রো রেল প্রকল্প – এসব ক্ষেত্রেই ভূগোলের বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হচ্ছে। জিআইএস ম্যাপিং-এর সাহায্যে শহরের প্রতিটি গলির সঠিক উপাত্ত সংগ্রহ করে, উন্নয়নের পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হচ্ছে। এভাবেই ভূগোল হয়ে উঠছে আধুনিক নগর নীতির মূল ভিত্তি।

কৃষি ও জলসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ভূগোলের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। ভারতের মতো কৃষিনির্ভর দেশে মাটির গঠন, বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর, কৃষি অঞ্চলের পরিবর্তন ইত্যাদি নিরীক্ষণের জন্য জিও-ইনফরমেটিক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। Precision Farming বা সুনির্দিষ্ট চাষ পদ্ধতিতে ভূগোলের ভূমিকা

অপরিসীম। কৃষকেরা এখন GPS ও স্যাটেলাইট-ভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করে কোন অঞ্চলে কোন ফসল উপযোগী তা জানতে পারছেন। ISRO-এর তৈরি BHUVAN প্ল্যাটফর্ম কৃষিক্ষেত্রে ভূগোলের ব্যবহারিক প্রয়োগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

COVID-19 মহামারী আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাতেও ভূগোল কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কোন এলাকায় সংক্রমণ বাড়ছে, কোথায় হটস্পট তৈরি হচ্ছে, কোথায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না – এসব বিষয় GIS ম্যাপিং-এর মাধ্যমে সহজেই বিশ্লেষণ করা যায়। এইভাবে ভূগোল জনস্বাস্থ্য, টিকাদান কর্মসূচি এবং মহামারী নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। 'Health Geography' এখন গবেষণার এক নতুন শাখা হিসেবে উঠে আসছে।

ভবিষ্যতে ভূগোলের পরিধি আরও বিস্তৃত হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), বিগ ডেটা, ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সঙ্গে মিলে ভূগোল পরিণত হবে এক নতুন ধারার বিজ্ঞানে। ভবিষ্যতের জিআইএস হবে Real-time, স্বয়ংক্রিয় ও পূর্বাভাস নির্ভর। দুর্যোগ পূর্বাভাস থেকে শুরু করে শহর পরিকল্পনা, এমনকি শিক্ষানীতিও ভূগোল নির্ভর হয়ে উঠবে। ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও ভূগোল গুরুত্বপূর্ণ হবে – যেমন দক্ষিণ চীন সাগর, আর্কটিক অঞ্চল কিংবা ভারত-চীন সীমান্তে জলের উৎস নিয়ে যে বিতর্ক, তা বিশ্লেষণ করতে হলে ভূগোল জানা জরুরি। এইভাবেই ভূগোল আগামী দিনে নিরাপত্তা, কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিকনির্দেশ দেবে।

জল ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও ভূগোল হবে অন্যতম হাতিয়ার। খরা ও বন্যা মোকাবিলায় জিআইএস নির্ভর পূর্বাভাস, বৃষ্টির ধরন বিশ্লেষণ, কৃষি এলাকা সনাক্তকরণ এবং পানীয়জল সঙ্কট নিরসনে ভূগোলভিত্তিক পরিকল্পনা অত্যন্ত কার্যকর হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামীণ উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও এই শাস্ত্র হয়ে উঠবে অনিবার্য।

শিক্ষাক্ষেত্রেও ভূগোল একটি সম্ভাবনাময় বিষয় হয়ে উঠেছে। আজকের শিক্ষার্থীরা ভূগোল পড়ে শুধু শিক্ষক বা গবেষক নয়; বরং জিআইএস অ্যানালিস্ট, স্মার্ট সিটি প্ল্যানার, পরিবেশ পরামর্শদাতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপক, ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক কিংবা ডেটা বিজ্ঞানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র উভয়েই ভূগোলবিদদের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

সবশেষে বলা যায়, ভূগোল এখন আর শুধুমাত্র 'পাহাড়-নদী চেনার' বিষয় নয়। এটি এমন একটি বিশ্লেষণাত্মক বিজ্ঞান যা অতীত বুঝে, বর্তমান ব্যাখ্যা করে এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করে। পরিবেশ রক্ষা, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ মোকাবিলা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নগর উন্নয়ন ও কৃষিতে ভূগোল একটি নির্ভরযোগ্য দিকনির্দেশক। তাই আগামী দিনে টেকসই উন্নয়নের জন্য ভূগোল-নির্ভর পরিকল্পনা শুধু প্রয়োজন নয়—বরং বাধ্যতামূলক হয়ে উঠবে। এক কথায়, ভূগোল আমাদের 'পৃথিবীকে জানার চাবিকাঠি'।

‘‘বাংলা ভাষার উৎস সন্ধানে’’ - একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা

ড. ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়
সংস্কৃত বিভাগ

বিভিন্ন প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষা এবং প্রাচীন পারসিক আবেস্তা ও বৈদিক তথা সংস্কৃত ভাষার মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ভাষাতাত্ত্বিক গন অনুমান করেন যে একটিমাত্র প্রাচীনতর মূল ভাষা থেকেই এই সকল ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। ভাষাতত্ত্বে এই অনুমিত মূল ভাষাটিকেই ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা বলা হয়। বিভিন্ন বিবর্তনের ফলে মূল ইন্দ ইউরোপীয় ভাষার দশটি শাখার উদ্ভব ঘটেছিল বলে ভাষাতাত্তিকেরা মনে করেন সেগুলি হল কেল্টিক, ইতালিক ,জার্মানিক, গ্রীক, তোখারীও, বালতোশ্লাবিক, আর্মেনীয়, আলবেনিয়া, ইরানীয়, হিট্টীয়।

- ভাষাবিজ্ঞানে ইন্দো-ইউরোপীয় নামক অনুমিত মূল ভাষার দশটি শাখার মধ্যে ইরান ও ভারতে প্রচলিত শাখাটিকে বলে ইন্দ ইরানীয় ভাষা গোষ্ঠী। প্রাচীন পারসিক ধর্মগ্রন্থ আবেস্ততার ও বৈদিক সাহিত্যের ভাষা এই শাখার অন্তর্গত এই গোষ্ঠী সপ্তমগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত।
- ভাষা হল সাধারণ মানব সমাজের সর্বদা ব্যবহারের উপযোগী এক সক্রিয় মাধ্যম তাই কালক্রমে তার মধ্যে যেমন অন্তর পরিবর্তন ঘটে তেমনি বহিরাগত প্রভাবও তার উপর পড়ে ভারতীয় আর্য ভাষাতেও তাই ভারতের নানা প্রাচীনতর জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত শব্দাবলী, ব্যাকরণগত নানা প্রয়োগ, বাক্য রীতির পরিধির কয়েকটি ভঙ্গি ও বাক ব্যবহার প্রণালীর অনুপ্রবেশ করেছে এবং ক্রমে সেগুলি ভারতীয় আর্য ভাষার বৈশিষ্ট্যরাজীর সাথে অভিন্ন রূপে লক্ষিত হয়েছে।
- পৃথিবীর প্রতিটি ভাষা অনুকৃতি পুনরাবৃত্তি ও সাদৃশ্যের কারণে সর্বদা বিবর্তিত হয় ফলে তার মধ্যে ধ্বনীগত ও রূপগত বিবর্তন সর্বদাই ঘটে চলে।
- বাংলা ভাষার উৎপত্তি একটি দীর্ঘ ও ধারাবাহিক ভাষাগত বিবর্তনের ফল। এটি প্রধানত ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের ইন্দো আর্য শাখা থেকে এসেছে। বাংলা ভাষার বিবর্তন সাড়ে তিন হাজার বছরের ইতিহাস জুড়ে বিস্তৃত।
- বাংলা ভাষার মূল উৎস হলো ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা পরিবার এই পরিবারের শাখা থেকে সংস্কৃত পালি প্রাকৃত পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ৫০০ পর্যন্ত সংস্কৃত ছিল ভদ্রজন ও পন্ডিতদের ভাষা
- এটি একটি নিখুঁত ও ব্যাকরণনিষ্ঠ ভাষা, যেটি ‘পাণিনি’ ও ‘পতঞ্জলি’র মাধ্যমে ব্যাকরণিকভাবে গঠিত হয়।
- বাংলা ভাষার বহু শব্দ সংস্কৃত থেকে এসেছে, যাকে “তৎসম শব্দ” বলা হয়। যেমন: সৃষ্টি, জ্ঞান, ধর্ম, কর্ম।
- প্রাকৃত ভাষা (খ্রিস্টীয় ৫০০ – ১০০০)
- প্রাকৃত ভাষাগুলি ছিল সংস্কৃতের সহজতর রূপ, যা সাধারণ মানুষ ব্যবহার করত।
- বাংলা ভাষার উৎপত্তির জন্য মাগধী প্রাকৃত ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
- মাগধী প্রাকৃত থেকেই পূর্বাঞ্চলের ভাষাগুলির বিকাশ ঘটেছে—বিশেষত বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া।
  অপভ্রংশ (খ্রিস্টীয় ৬০০ – ১২০০)

- প্রাকৃত ভাষার পরিবর্তিত রূপকে "অপভ্রংশ" বলা হয়।
- মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে।
- এই পর্যায়ে ধীরে ধীরে আধুনিক বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য গঠিত হতে থাকে।
- প্রাচীন বাংলা (৯৫০ – ১২০০ খ্রি.)
- এটি বাংলা ভাষার আদি রূপ। এ সময় কিছু সাহিত্য পাওয়া যায় যেমন: চর্যাপদ (৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ)।
- চর্যাপদ হলো বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন, যা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ রচনা করেন।
- এ ভাষায় অনেক সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ শব্দের মিশ্রণ দেখা যায়।
- মধ্যবাংলা (১২০০ – ১৮০০ খ্রি.)
- মুসলিম শাসনের সময় বাংলা ভাষায় আরবি-ফার্সি শব্দ ঢুকে পড়ে। যেমন: আদালত, কাগজ, খবর, দোয়া।
- এই সময়ে কাব্য ও ধর্মীয় সাহিত্য যেমন মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হয়।
- বাংলার বিভিন্ন উপভাষার বিকাশ ঘটে।
- আধুনিক বাংলা (১৮০০ – বর্তমান)
- আধুনিক বাংলা ভাষার সূচনা হয় ফর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা গদ্যচর্চার মাধ্যমে।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ এই ভাষাকে সাহিত্যে পরিণত করেন।
- বাংলা গদ্য ও কবিতার এক বিপুল রূপান্তর ঘটে এই সময়ে।
- উপভাষা ও বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই
- বাংলা ভাষার আছে অনেক উপভাষা বা আঞ্চলিক রূপ:
- রাঢ়ী (মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা)
- বরেন্দ্রী (উত্তর-পশ্চিম)
- প্রাচ্য (ঢাকা, ময়মনসিংহ)
- চাটগাঁইয়া (চট্টগ্রাম)
- সিলেটী
- কলকাতার শহুরে ভাষা (স্ট্যান্ডার্ড বঙ্গভাষা)
- আধুনিক প্রভাব পর্যবেক্ষণ করলে দেখি
- ইংরেজ শাসনের সময় ইংরেজি থেকে প্রচুর শব্দ এসেছে: স্কুল, রেল, পোস্ট, লাইট, গাড়ি।
- বর্তমানে বাংলা ভাষা টেকনোলজি, সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই ভাষার চলন আলাদা হলেও মূল কাঠামো এক।
- তাহলে গবেষণালব্ধ বিষয়গুলি হলো এইরকম যে
- বাংলা ভাষা:
- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারের সদস্য,
- মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত,
- চর্যাপদের যুগে তার সাহিত্যিক অস্তিত্ব,

- মধ্যযুগে নানা শাসকগোষ্ঠীর প্রভাবে সমৃদ্ধ,
- আধুনিক যুগে এক উন্নত সাহিত্য ও প্রযুক্তির ভাষা।
- ইন্দো-ইরানীয় ভাষা
- ↓
o সংস্কৃত
- ↓
- মাগধী প্রাকৃত
- ↓
- মাগধী অপভ্রংশ
- ↓
- প্রাচীন বাংলা
- ↓
o মধ্য বাংলা
- ↓
- আধুনিক বাংলা
- ↓
- সমসাময়িক বাংলা
- স্তর ও বৈশিষ্ট্য
- সংস্কৃত- জটিল ব্যাকরণ, ধর্মীয় ভাষা।
- প্রাকৃত- কথ্য ভাষা, সহজ রূপ।
- অপভ্রংশ- আরও সরলীকরণ।
- প্রাচীন বাংলা- চর্যাপদ ভাষা।
- মধ্য বাংলা- ফারসি প্রভাব।
- আধুনিক বাংলা- রবীন্দ্রনাথ, নজরুল
- সমসাময়িক বাংলা- প্রযুক্তিনির্ভর, গণমাধ্যম মোবাইল অ্যাপ, ফেসবুক।
- ইতিহাসবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী সুকুমার সেন বাংলা ভাষার বিবর্তন সম্পর্কে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'History of Bengali Literature' (১৯৬০) ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন গবেষণায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন।
- সুকুমার সেনের ভাষ্যে, বাংলা ভাষার বিকাশ ছিল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সংস্কৃত এবং মধ্য-ইন্দো-আর্য ভাষার মধ্যবর্তী বিকৃত রূপ থেকে বাংলা ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে নিজেকে গড়ে তোলে, এরপর মধ্যযুগে ক্রমশ উন্নয়ন লাভ করে এবং ১৮০০ সালের পর আধুনিক রূপে পরিণত হয়। এই বিবর্তনের প্রতিটি পর্যায়েই ভিন্ন ধরণের ব্যাকরণিক ও ভাষাগত পরিবর্তন ঘটেছে।
- বাংলা এখন শুধু বাংলা সাহিত্য বা সংস্কৃতির ভাষা নয় — এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ভাষা, যেখানে প্রায় ৩০ কোটিরও বেশি মানুষ কথা বলে। এই ভাষা একদিকে যেমন রবি ঠাকুরের কবিতার বাহক, তেমনি গুগলের অ্যান্ড্রয়েড বা অ্যাপল-এর ভাষাও হয়ে উঠছে আজ। বিশ্বের পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছে এই ভাষা। সত্যি "মোদের গরব মোদের আশা আ- মরি বাংলা ভাষা"।

- “আমি বাংলায় গান গাই আমি বাংলার গান গাই আমি আমার আমি কে চিরদিন এই বাংলায় খুজে পাই”।

তথ্যসূত্র-

- ভাষাতত্ত্ব - রত্নাবসু।
- ভাষাতত্ত্ব - ড.কমল কৃষ্ণ চক্রবর্তী।
- ড.সুকুমার সেন - বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।
- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় - ব্রিগেড ভাষণ 2025
- লাইব্রেরী সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যাপীঠ ও google

উচ্চশিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)

মৃত্যুঞ্জয় লোহার
শিক্ষাকর্মী

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence (AI) বর্তমান পৃথিবীতে এক বিপ্লব এনে দিয়েছে। এটি আমাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষত উচ্চশিক্ষায়, AI-এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও বহুমাত্রিক। আজকের দিনে বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার পদ্ধতি, উপকরণ এবং মূল্যায়ন কাঠামোতে AI প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে এক নতুন শিক্ষায়ন-সংস্কৃতি গড়ে তুলছে।

উচ্চশিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো ব্যক্তিকৃত শিক্ষা (Personalized Learning)। AI প্রযুক্তি শিক্ষার্থীর শেখার গতি, আগ্রহ, দুর্বলতা এবং দক্ষতা বিশ্লেষণ করে তার উপযোগী পাঠ্যবিষয়বস্তু বা শেখার কৌশল নির্ধারণ করতে পারে। ফলে, একজন শিক্ষার্থী নিজস্ব গতিতে, নিজের পছন্দমতো এবং যথাযথভাবে শিখতে পারে। যেমন, একজন গণিতে দুর্বল ছাত্রের জন্য AI নির্দিষ্ট করে যে বিষয়গুলোতে তার ঘাটতি রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী উপকরণ সরবরাহ করে। এটি কেবল শিখনকে সহজ করে না, বরং শেখার প্রতি আগ্রহও বাড়ায়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো চ্যাটবট ও ভার্চুয়াল সহকারীর ব্যবহার। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ এখন AI-ভিত্তিক চ্যাটবট চালু করেছে, যেগুলি শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দেয়, বিভিন্ন প্রশাসনিক তথ্য প্রদান করে এবং এমনকি মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়েও সহায়তা করে। এই চ্যাটবটগুলি ২৪/৭ কাজ করে এবং শিক্ষক বা প্রশাসনিক কর্মীদের উপর থেকে প্রচুর চাপ কমায়। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্নাতকস্তরে ভর্তির অনলাইন সেন্ট্রালাইজড অ্যাডমিশন পোর্টালে (Centralized Admission Portal) ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে পড়ুয়াদের জানতে সাহায্য করছে এই চ্যাটবটগুলি।

AI প্রযুক্তির মাধ্যমে মূল্যায়ন ও ফল বিশ্লেষণ ব্যবস্থাও ব্যাপকভাবে উন্নত হয়েছে। এখন অনেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করছে, ইন্টারনাল অ্যাসাইনমেন্ট চেক করছে এবং শিক্ষার্থীর উন্নয়ন বিশ্লেষণ করছে। AI পূর্ববর্তী পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ পারফরম্যান্সের পূর্বাভাস দিতে পারে, যার মাধ্যমে শিক্ষকরা কোনো শিক্ষার্থীর দুর্বলতা আগেভাগেই বুঝে তাকে কাউন্সিলিং করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারেন। এতে শিক্ষা আরও গঠনমূলক ও সহানুভূতিশীল হয়ে উঠছে।

উচ্চশিক্ষায় গবেষণার ক্ষেত্রেও AI এক বিপ্লব এনেছে। জটিল ডেটা বিশ্লেষণ, প্যাটার্ন শনাক্তকরণ, প্রেডিকশন মডেল তৈরি—এসব ক্ষেত্রে AI-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান, গণিত, সমাজবিজ্ঞান এমনকি সাহিত্য বা ইতিহাসের মতো বিষয়েও এখন AI ব্যবহার করে গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। Natural Language Processing (NLP), Machine Learning (ML) ও Big Data Analytics এর মতো AI প্রযুক্তি গবেষণার গতি ও গুণগত মান বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

এছাড়াও, AI-এর মাধ্যমে অনলাইন ও অফলাইন মোডে পাঠদান (Hybrid Learning) ব্যবস্থাও উন্নত হয়েছে। অনলাইন ক্লাসে স্বয়ংক্রিয় ক্যাপশনিং, ভাষা অনুবাদ, পাঠ্যবিষয়বস্তুর স্বয়ংক্রিয় সংকলন

ইত্যাদি সুবিধা AI-এর মাধ্যমেই সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য শেখার পরিবেশ আরও সহজ ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LMS) যেমন Moodle, Blackboard, Google Classroom ইত্যাদিতে AI-এর একত্রীকরণ শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মনিটর করার সহজ ব্যবস্থা দিচ্ছে।

AI উচ্চশিক্ষার প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও বিপুল অবদান রাখছে। ভর্তি প্রক্রিয়া, ফলাফল প্রকাশ, সময়সূচী নির্ধারণ, কোর্স ম্যানেজমেন্ট, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রশাসনিক কাজে AI ব্যবহৃত হচ্ছে, যার ফলে সময় ও মানবশক্তির অপচয় কমছে এবং প্রশাসন আরও নির্ভুল ও দক্ষ হয়ে উঠছে।

AI উচ্চশিক্ষাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক করে তুলছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য যেমন—দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য স্ক্রিন রিডার, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ক্যাপশন সিস্টেম, ডিসলেক্সিয়া আক্রান্তদের জন্য উপযুক্ত ফন্ট ও কনটেন্ট—এসব প্রযুক্তির অধিকাংশই AI ভিত্তিক। এর ফলে শারীরিকভাবে সক্ষমতা-বানচিত শিক্ষার্থীরাও সমান সুযোগে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে।

তবে AI ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ ও নৈতিক প্রশ্নও উঠে আসছে। যেমন, শিক্ষার্থীর তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা, পক্ষপাতদুষ্ট অ্যালগরিদম, AI-এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, শিক্ষকের ভূমিকা হ্রাস পাওয়া—এসব বিষয় উচ্চশিক্ষা নীতিনির্ধারকদের মাথায় রাখতে হবে। প্রয়োজন নিয়মনীতি, স্বচ্ছতা ও মানবকেন্দ্রিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ।

সবশেষে বলা যায়, AI প্রযুক্তি উচ্চশিক্ষাকে কেবল আধুনিক করে তোলেনি, বরং এটি শিক্ষার দর্শনকেও পরিবর্তন করছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, পাঠদানের ধরণ, মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং গবেষণার কাঠামো—সবকিছুতেই AI এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। ভবিষ্যতের উচ্চশিক্ষা AI নির্ভর হলেও তা যেন মানবিক, নৈতিক এবং সমতাভিত্তিক হয়—এই চেতনায় আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

দীঘা ভ্রমণ

অন্তরা রায়
ইংরেজী বিভাগ (4th Semester)

জীবন সেই একই বাধা ধরা নিয়মেই চলছিল পড়াশোনা, কলেজ, টিউশন। হঠাৎ একদিন বন্ধুবান্ধব সবাই মিলে ঠিক হলে ঘুরতে যাওয়ার। এই একঘেয়ে জীবন থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে চাইলাম সবাই। শহরের কোলাহল ছেড়ে প্রকৃতির মাঝে মিলিয়ে যাওয়ার এক অতৃপ্ত বাসনা জেগে উঠলো। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক হলো দীঘা। সাগরের ডাক যেন মনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল বারংবার। রাত্রি বারোটায় বাসে করে রওনা হলাম। ভোরের আলো ফুটতেই জায়গাটাকে দেখে যেন আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলাম সবাই। গ্রামের পর গ্রাম, ধানখেত নারকেল গাছ। সে কি অপূর্ব দৃশ্য যতদূর চোখ যায় শুধুই সবুজে সবুজ চারদিক। প্রকৃতি মা তার সৃষ্টিকে ভোরবেলায় কি মনোমুগ্ধকর রূপেই না সাজিয়েছেন। ভোর বেলার স্নিগ্ধ বাতাস হৃদয়কে বারবার স্পর্শ করছিল। পুরো শরীরকে যেন চনমনে করে তুলছিল। বাসের মধ্যে সবাই মিলে হাসি ঠাট্টা, গান, প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন দীঘা এসে পৌঁছে গেলাম বুঝতেই পারলাম না। হোটেলে ব্যাগ পত্র রেখে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে দৌড়ে চলে গেলাম সমুদ্রে। সমুদ্র যেন ডাকছিল আমাদের। তারপর প্রথম যখন সমুদ্রকে নিজের চোখের সামনে দেখলাম কিছু মুহূর্তের জন্য যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলাম। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শুধু জল আর জল, অবিরত ঢেউ আসছে আর যাচ্ছে সবকিছু দেখে আমার চোখ তো পুরো আটকে গেল। সমুদ্রের জলে পা ডুবিয়ে এক অদ্ভুত শান্তি কাজ করেছিল মনের মধ্যে। কিছুক্ষণ সেখানেই কাটালাম তারপর হোটেলে ফিরে খাওয়া দাওয়া করে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে বেরিয়ে পড়লাম দীঘার সমুদ্রে সান্ধ্যকালীন দৃশ্য অনুভব করার জন্য। প্রথম দিন নিউ দীঘা এবং ঢেউসাগর গিয়েছিলাম। সন্ধ্যেবেলায় নিউ দীঘার পাড়ে বসে সে কি অনুভূতি। সমুদ্রের শীতল বাতাস, ঢেউয়ের শব্দ মনকে যেন এক অদ্ভুত শান্তি প্রদান করছিল। সমুদ্রের পাড়ে সময় কাটিয়ে ফুটপাতের দোকান ঘুরে, কেনাকাটা করে হোটেল রুমে ফিরলাম। দ্বিতীয় দিন ভোরবেলাতে গিয়েছিলাম মোহনার সূর্যোদয় দেখতে। কিছুটা দেরি হওয়ার কারণে সূর্যোদয় আর দেখা হয়ে উঠল না ঠিকই, কিন্তু ভোর বেলায় সমুদ্রের এক আলাদাই দৃশ্য। কলরব ছাড়া পরিবেশ, বিস্তীর্ণ জলাভূমি, ছোট ছোট ঢেউ। সেই ছোট ছোট ঢেউ যখন আমার পায়ে এসে স্পর্শ করছিল, আমার পুরো শরীরকে যেন নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছিল সে ঢেউ। ভোর বেলায় সমুদ্রের পরিবেশ সত্যিই অসাধারণ। সেই দিন দীঘার জগন্নাথ মন্দির, অমরাবতী পার্ক, দীঘা বিজ্ঞান কেন্দ্র ঘুরে আমরা রুমে ফিরে আসলাম। তারপর দুপুরের খাবার খেয়ে আবার সমুদ্রে যাওয়া। সবাই মিলে সেখানে হই হুল্লোর করে সমুদ্রে স্নান। সত্যিই চিরদিন এই স্মৃতিগুলি জীবনের খাতায় আঁকা থাকবে রঙিন অক্ষরে। সেদিন রাতেই ছিল বাড়ি ফেরার পালা। তাই শেষ বারের মতন আমরা সবাই সন্ধ্যের দিকে সমুদ্রের পাড়ে গিয়েছিলাম কিছুটা সময় কাটাতে। তারপর রুমে এসে গোছগাছ করে বাসে উঠে পড়লাম। সবারই মন খুবই খারাপ ছিল। এই সুন্দর সমুদ্রকে বিদায় দিতে কারই বা মন চাই? কিন্তু জীবনের স্রোতে তো এগিয়ে যেতেই হবে। এই ভ্রমণ শুধুমাত্র আমার কাছে ঘোরাফেরা আনন্দ করা ছিল না, ছিল নতুন কিছু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা। আগে অনেক জায়গায় গিয়েছি কিন্তু বাড়ি ফিরে ফোনের গ্যালারিতে ছবি ছাড়া আর কিছুই পাইনি। ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা আর লোককে দেখানো, কোথায় গিয়েছি? কি করেছি? কিন্তু এবার ছবি তুললেও, প্রধান লক্ষ্যই ছিল মন ভরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপলব্ধি

করা। বাড়ি এসে চোখ বুজে ভাবতে বসলেই যেন সব ভেসে ওঠে। এক অদ্ভুত আনন্দ যেন কাজ করে মনের মধ্যে। হ্যাঁ এইবার ফোনের গ্যালারিতে বেশি ছবি তোলার চেয়ে, মুহূর্তগুলিকে বেশি বেশি করে উপলব্ধি করেছি।জীবনের ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে নতুন করে খুঁজে পেয়েছি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে শিখেছি, প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে শিখেছি। ফোনের গ্যালারিতে শুধু ছবি নিয়ে নয় অনেক অনেক নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরেছি এইবার। জীবনের ব্যস্ততার মধ্যে এমন মাঝে মাঝে প্রকৃতির কোলে নিজেকে হারিয়ে ফেলা সত্যিই বড় প্রয়োজন এমন বাঁধাধরা জীবনে।

ব্যর্থ সোহাগ

মুদ্রা পাত্র
বাংলা বিভাগ (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

সালটা হলো ১৯৯৩, স্নিগ্ধময়ী ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত সুন্দরপুর গ্রাম। গ্রামতো নয় যেন একেবারে স্বর্গরাজ্য। গ্রামটির নামের সাথে তার অভিনবত্বও মিলে গেছে। গ্রামে প্রবেশকরলেই দেখতে পাওয়া যায় রাঙামাটির কোমল পথ যার দু -পাশে তাল - সুপারির সারি , ভুট্টা, ধান, আখের ক্ষেত, আম - কলার বাগান। মাটির বাড়িগুলোতে খড়ি মাটি দিয়ে লতা পাতা, ফুল ও পশুপাখির নকশা আঁকা। প্রতি মুহূর্তে যেন বাউল বাতাস কানের পাশে ফিসফিসিয়ে যাচ্ছে। প্রায় প্রতিটি ঘরেই খড়েরস্তূপ, গো - শালা,বাঁশের বেড়া, গাভী, ছাগল, মহিষ দোরগোড়ায় দড়ি বাঁধ দেওয়া। এখানে ভোরের আকাশে সূর্য যখন কুয়াশার বুক চিরে তার স্বর্ণালী আলোক কিরণকে ছড়িয়ে দেয়, তখন এই গ্রামের বুক বেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ানো চড়ুই, তিতির, শালিখ ও বলাকার দল তাদের কিচিরমিচির ডাকে সকলকে ভোরের আভাস দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চায়।

রবি ঠাকুর যেন এই সুন্দরপুর গ্রামের জন্যই ‘গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ, আমার মন ভুলায় রে’ গানটি লিখেছেন।গ্রামের শেষমাথায় ছিল একটা পুরনো বটগাছ। এর নীচে একটা পুরনো জীর্ণ চট বিছিয়ে, মাঝখান থেকে ফেটে যাওয়া একটা ছোট্ট আয়না, মূর্ছা পড়ে যাওয়া একটা কাঁচি, দু - তিনটে দাঁড়া ভাঙ্গা চিরুনি, একটা খুর, আর একটা ক্ষয়ে যাওয়া ফিটকিরি এইসব নিয়েই হলো অনাদির সেলুন। আজ একটু সকাল-সকাল স্নান সেরে অনাদি সেলুনে এসে একটা ধুনোধূপ ধরিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে মনেমনে স্মরণ করছিল, ঠিক এমনসময় একটা সাইকেল এসে থামলো, আসলে পাশের শহরের কলেজের অধ্যাপক ড: পরিমলবাবু প্রতিবারের মতো এবারো অনাদির সেলুনে চুল, দাঁড়ি কাটতে এসেছেন, আর এইবার তিনি তার বছর ছয়ের ছেলে বাবানকেও সাথে করে নিয়ে এসেছেন।

তিনি যেমন সাধারন থাকতে পছন্দকরেন তার ছেলেও ঠিক তেমনই হয়েছে। অনাদি ইতস্তত হয়ে বললো - ‘‘পফেছার বাবু বসুন বসুন, এ --এসো বাবান বাবাজীবন এসো, কত্ত বড় হয়ে গেছে’’ । পরিমলবাবু মৃদু হেসে বললেন :- ‘‘আরে ঠিকআছে নাও এত ব্যস্ত হয়োনা, তা আমাদের তিয়াসা মা’কে তো দেখছিনা, ও কোথায়? আজ ওর সাথে আমার ছেলের আলাপ করাবো ভেবেছি’’ অনাদি মাথাচুলকে বললো - ‘‘আজ্ঞে তিয়াসা মা, এ-এক্ষুনি আসবে আমার জন্য খাবার নিয়ে, ততক্ষনে বরং আমি আপনার চুল-দাঁড়িটা একটু কামিয়ে দিই।’’ অনাদির একমাত্র মেয়ে হলো তিয়াসা।

----এরপর পরিমলের চুলদাঁড়ি কাঁটা হলো। ওদিকে শিশু হৃদয়ের চঞ্চলতা বাবানকে আকুল করে তুলেছে, তার নতুন বান্ধবীর সাথে আলাপ হবে। সে লুকিয়ে লুকিয়ে বুক পকেটে তিয়াসার জন্য লজেন্সও নিয়ে এসেছে।

তিয়াসা এলো মুড়ি আর চানাচুর নিয়ে। পরিমলবাবু বললেন - ‘‘বাবান! এই তোমার নতুন বন্ধু তিয়াসা।’’

বাবান গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসে তিয়াসাকে লজেন্স দিয়ে বললো :- ‘‘এ--ই আমাল সাথে বন্ধু পাতাবে টিয়াসা?’’ তিয়াসা খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বললো- ‘‘ধুরর.. আমাল নাম টিয়াসা নয় গো --
‘তিয়াসা’ ‘‘অনাদি আর পরিমলবাবুও এবার হেসে আত্মহারা। এরপর পরিমলবাবু তিয়াসার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন - ‘‘মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করেছো?’’ উত্তরে অনাদি বললো - ‘আজ্ঞে না’। খানিক রেগে গিয়ে পরিমল

বাবু বললেন - "সেকি! ওকে কালই স্কুলে ভর্তি করো আমিও কাল বাবানকে ভর্তি করবো।" এই বলে ওরা চলে গেল। বিকেলে পরিমলবাবু এক গ্রামের লোকের হাতে তিয়াসার জন্য স্কুলের পোশাক, বই,খাতা, কলম ও ব্যাগ দিয়ে পাঠিয়েছেন। পরেরদিন বাবান তিয়াসাকে স্কুল যাওয়ার জন্য ডাকতে এসেছিলো, এরপর ওরা দুজন একসাথে বেরোল।

রাস্তায় বাবান বেশ অবাস্তব হাসির কিছু প্রশ্ন করছিল। বলছিলো - "তিয়াসা, আচ্ছা ধর এই সূর্য টা যদি তোর মাথায় ধাম করে এসে পলে!" "উত্তরে তিয়াসা বললো - পললে তোর মাথাতেও তো পলবে রে আমার একা কি?" তারা স্কুলে একসাথে টিফিন ভাগ করে খেত, তিয়াসার মায়ের বানানো আলুর পরোটা বাবানের খুব প্রিয় ছিল তাই তিয়াসার মা যখনই আলুর পরোটা বানাতেন তখন বেশি করে দিয়ে পাঠাতেন। কখনো বাড়ি ফেরার পথে দুজনেই মাঝে মাঝে কারোর বাড়ির আঙিনায় রোদে দেওয়া রকমারি আচার নামানো দেখতে পেলে , তিয়াসা হয়তো আচার মালিকের সাথে গল্প করার ছল করত আর ওই ফাঁকে বাবান আচার নিয়ে পগার পার।

ওরা বিকেলে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে খেলতে যেত।ওটা হলো তিয়াসার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা । সেখানে তারা আরও চার - পাঁচজন বন্ধু মিলে লুকোচুরি খেলত।

তিয়াসা'ই বেশিরভাগ সবাইকে খুঁজতে যেত । বাবান আবার কখনো কখনো একটু দূরে থাকা পেয়ারা গাছে বসে লুকিয়ে থাকতো আর ওপর থেকে কচি পেয়ারা তিয়াসার মাথায় ছুঁড়লে সে বেশ অভিমানী হয়ে উঠত। কিন্তু ঢোলকলমি ফুল বাবান যখন তিয়াসার কানের কাছে গুঁজে দিত তখন ওর অভিমানী মুখ বেয়ে এক মায়াময় হাসির ঝলকানি ছড়িয়ে পড়তো সারা নদীতীর জুড়ে। নদীতীরের জংলা ঘাসের পিছনে লুকিয়ে থেকে বাবান কখনো কখনো তিয়াসাকে শেয়ালের ডাক ডেকে ভয় খাইয়ে দিত আর তিয়াসাও ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে দিত, সে রেগে গিয়ে বাবানের কানগুলো কশে মলে দিত। ময়ূরাক্ষীর চঞ্চল স্রোতে তারা কাগজের নৌকা বানিয়ে ভাসাতো। বৃষ্টির দিনে কচু পাতা মাথায় দিয়ে ওরা বাড়ি ফিরত।

এমনি করে দেখতে দেখতে প্রায় ১০ বছর কেটে গেলো। এখন ওরা একই কলেজের শিক্ষার্থী। বাবান বেশ সুন্দর ভায়োলিন বাজাতে পারতো। তিয়াসার প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত "কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে" এটা সে ময়ূরাক্ষীর তীরে এসে ওকে বাজিয়ে শোনাত।একদিন নিভৃত সন্ধ্যায় ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে প্রকৃতি মায়ের বিছিয়ে দেওয়া সবুজ ঘাসের বিছানায় এসে বসলো দুজন।বাবান একগুচ্ছ কদম আর এক জোড়া ঝুমকো তিয়াসাকে হাতে দিল। তিয়াসার চাঁদপানা মুখশ্রী, চঞ্চল কেশরাশি, দুঃখভোলানো আঁখির চাওনি এসব যেন বাবান আজ মনভরে দেখেনিচ্ছিল। তিয়াসার হাতে এগুলোদিয়ে বাবান বললো - 'নে তোর জন্য' !! তিয়াসা বললো - "এই তোকে এত কান্ড কে করতে বলেছে বলতো? উফ যত ঢং!!" সেই মুহূর্তে বাবান ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

তিয়াসা তৎক্ষণাৎ বাবানকে বুকের মাঝে এনে জড়িয়ে ধরে বললো - "এই পাগল তোর কি হয়েছে বলতো কাঁদছিস কেন? বড় হয়েছিস না ছাই! এই ...বল না" ? উত্তরে বাবান বললো - " আমার বাবা প্রিন্সিপাল পদে হুগলি কলেজে ট্রান্সফার হয়ে যাবে, আর আমাদের দেখা হবে নারে, কালকেই আমরা হুগলিতে চলে যাবো এই আমাদের শেষ দেখা। এই বেদনাঘন কথাশুনে তিয়াসার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। তিয়াসা এবার বাবানকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে অশ্রুপাত করতে লাগলো। কেউ আর কোন কথা বলল না শুধু দমবন্ধ হওয়া এক নিস্তব্ধতা সেখানে বিরাজ করছিল ।শেষে বাবান তার হাতের ঘড়িটা তিয়াসার হতে ধরিয়ে দিয়ে বলল - "এই নে এটা রাখ। যখনই আমায় মনে পড়বে এটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আগলে রাখিস।"

এরপর ৬ - ৭ বছর কেটে যায়। এরমাঝে প্রথমদিকে যদিও চিঠি দিয়ে ওদের কথা বার্তা চলত কিন্তু বন্যা বিপর্যয়ে তিয়াসার মা - বাবা ও ঘরবাড়ি ভেসে যাওয়ার পর থেকে বাবানের পাঠানো চিঠির কোন উত্তর সে দিতে পারতোনা। তিয়াসার শারীরিক অবস্থা ধীরে ধীরে মুষড়ে যাচ্ছে। চোখ-মুখ ফ্যাকাসে, খাবারে অরুচি, ঘাড়ে মাঝে মধ্যে প্রচণ্ড ব্যাথা হয়। বন্যায় কবলিত হওয়ার পর থেকে সে গ্রামতুতো এক বোনের বাড়িতে থাকতো। একদিন বিকেলে তাকে পোস্টমাস্টার বাবানের একটা চিঠি দেয়। আজ কোনভাবে সে চিঠিটা পড়লো, লেখা আছে --- আজ বিকেলে বাবান তার সাথে দেখা করতে আসবে। ময়ূরাক্ষী নদী যেন আজ এই অপরিণত বাল্যপ্রেমের পুনরায় মিলনের আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠেছিলো।

ছোটবেলার বন্ধু তিয়াসার জন্য একটি নদী কিনবে ভেবেছে বাবান! একরাশ শান্তি আর অনাবিল প্রেমের আনন্দ - সমীরে তারা অবগাহন যে করতে পারবে। তিয়াসার আগেই বাবান সেখানে এসে গেছিল। তিয়াসা বাবানের পাশে এসে বসলো, এরপর দুজন দুজনকে প্রাণ ভরে দেখে নিল। পরস্পর পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন করলো। এরপর বাবান তিয়াসাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়ে, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। এর ক্ষণ মুহূর্ত পরই তিয়াসার জ্ঞান হারিয়ে যায়। এমন অবস্থা দেখে বাবান আর দেরি না করে সোজা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ডক্টর বাবু ৩ ঘন্টা পর এসে বলেন - "এখানে বাবান বলে কেউ আছে?" বাবান বলে - "আমি ডাক্তারবাবু"!! আপনি কে হন পেশেন্ট এর? বাবান বলে - "ওর ছোটবেলার বন্ধু"। ডক্টর বলেন - কেমন বন্ধু আপনি? পেশেন্ট থার্ড স্টেজ ক্যান্সার আক্রান্ত আপনি কিছুই জানেন না! And I am sorry! She is no more. Radiation দিয়ে অনেক চেষ্টা করলাম বাঁচানোর। দফায় -দফায় হার্ট অ্যাটাকে তিনি মারা গেছেন। হ্যাঁ তবে শেষে একবার উনি 'বাবান ভালো থাকিস' বললেন। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম যে 'বাবান' কে! আর এই ঘড়িটা উনি হাতে মুঠো করে ধরে রেখেছিলেন, এটা রাখুন। আসলে এটাই সেই ঘড়ি যেটা বাবান আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে তার হৃদয়াঙ্গিনীকে নিজের চিহ্ন স্বরূপ দিয়ে গেছিল।

বাবান কোন কথা না বলে এক ছুট্টে তিয়াসার মৃতদেহর কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে দুরুদুরু বুকে কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলো-"কেন আমায় একা করে চলে গেলি!! বল না, কখনো তো বলিসনি যে তোর...।" বাবানের কণ্ঠগহ্বর আটকে গেলো দীর্ঘ নিঃশ্বাসের চাপে। এরপর তিয়াসার প্রিয় জায়গা ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে; তিয়াসার পছন্দের ঢোলকলমি ফুলের মালা আর চন্দনের ফোঁটায় সাজিয়ে বাবান তার প্রিয়তমার মুখাগ্নি করলো। বাবানের বাড়ির লোক ও সারা গ্রাম ভেঙে সবাই সেখানে তাদের মেয়েকে বিদায় জানাতে এসেছিলো।

তিয়াসার মৃত্যুর এক সপ্তাহ কেটে গেলো। শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন না হওয়া অবধি বাবানরা এই সুন্দরপুরের এক মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে থাকছিল। আজ শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো। এই সাতদিনে বাবানের মানসিক অবস্থা একেবারে উন্মাদের মতো রূপ ধারন করেছে। এতদিনেও সে তার দু - চোখের পাতা এক করতে পারেনি। ফলে তার চোখের নীচে যেন অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার জমে গেছে। অগোছালো দাঁড়িতে সারাগাল ভরে উঠেছে। তিয়াসার মৃত্যুর দিনে বাবান যে জামাটি পরেছিল, আজও সেই একই বেশে সে বেদনাক্লিষ্ট চিত্তে পাষাণমূর্তির মতো তিয়াসার প্রদীপ্ত হাসিমুখের ফ্রেম বাঁধানো ছবিটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। বাবানের মা তথা যামিনীদেবী অনেক জোরজুলুম করে ছেলেকে আজ অনেকদিন পর মনের মতো করে খাওয়াতে পেরেছেন।

রাত্রে তিনি বাবানের সাথেই ঘুমোতেন, ছেলে নিজের সাথে কিছু অঘটন ঘটিয়ে ফেলে যদি, সেই ভয়ে তিনি ছেলেকে কখনও একা শুতে দিতেন না। ছেলেকে এভাবে তিলে তিলে কষ্টপেতে দেখে যামিনী দেবীর

মনেও কষ্ট কোন অংশে কম ছিলনা। তাছাড়া তিয়াসাকে ওনারা নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসতেন ; তার অকাল প্রয়ানে খুবই মর্মাহত হয়েছেন তারা। যামিনীদেবী বাবানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন; বাবান যেন আজ কিছু মুহূর্ত পরই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েপড়লো। যামিনীদেবীও কিছুক্ষন পরে গভীরঘুমে তলিয়ে গেলেন। কিন্তু তাদের দেওয়াল ঘড়িটা যখন দুটো ঘণ্টার শব্দ বাজিয়ে বুঝিয়েদিল যে এখন রাতদুটো , তখন হঠাৎই ঘুম ভেঙেগেল বাবানের , তার যেন মনে হলো যে তিয়াসা তার জন্য অপেক্ষা করছে তাই সে violin আর তিয়াসার ছবিটা নিয়ে এক দৌড়ে চলেগেল ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে।

বৃষ্টিসিক্ত সবুজ ঘাসের ওপর তিয়াসার ছবিটাকে বেশ সাবধানে রাখলো বাবান, এরপর তারপাশে বসে সে ভায়োলিন এ তিয়াসার পছন্দের রবীন্দ্রসংগীতটি বাজলো। ঠিক আগেরমতই সেই অনবদ্য সুরের মধুরতা যেন ময়ূরাক্ষী নদীর অন্তরেও প্রেমের জোয়ার বইয়ে দিল। এই অনিন্দ্য সুন্দর সুরের মাধুর্যতা উপভোগ করতে রাতের আকাশে জেগে থাকা চাঁদ, ধ্রুবতারা, আর শুকতারারা যেন যুগ যুগ ধরে অপেক্ষার প্রহর গুনছিল। কিছুক্ষন পর ঘনকালো বিরহী মেঘেদের ভেলায় সারা আকাশ ছেয়ে গেল। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হলো। মনে হলো যেন তিয়াসা ওই বিরহী মেঘেদের ভেলায় এসে তার প্রাণের মানুষের বাজানো সুর শুনে আঁখিবারি ঝরাচ্ছে। ভায়োলিন বাজানো শেষে বাবান ঠিক আগে যেমন তিয়াসাকে জিজ্ঞাসা করতো আজও ঠিক তেমনি - ‘‘কি রে শাকচুন্নি! কেমন বাজালাম?’’

এইবলে সে ছবিটা বুকে নিয়ে তার বৃষ্টিভেজা মাথা ঝাঁকড়িয়ে খিলখিলিয়ে হাসতে লাগলো।

এরপর ৩ টে চারচাকা গাড়ি নদীতীরে সারি দিয়ে দাঁড়ালো। তারা আর কেউ নন বাবানের মা -বাবা, আর সারাগ্রামের লোক, তারা লণ্ঠন হাতে সেখানে ছুট্টে আসে । বাবানকে তার মা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে গাড়িতে জোর করে টেনে তুলে দেয় এবং এবার সোজা হুগলীর বাড়ির পথে। বাবান তিয়াসার ছবিটা বুকে শক্তভাবে জড়িয়েই ছিলো, যাতে কেউ তার ছায়াসঙ্গিনীর স্মৃতিসুধাতে গরল মেশাতে না পারে। বাবান উন্মাদের মতো চিৎকার করে বললো - ‘‘আমার ভায়োলিনটা কই ?? কোথায় -----?? আমার এক্ষুনি চাই, ওটাতে-- ওটাতে আমার তিয়াসার নরম হাতের ছোঁয়া, হাসির ঝলকানি মিশে আছে। ’’ এরপর ভায়োলিনটা ড্রাইভার দ্রুত নিয়ে এসে গাড়িতে রাখলো এবং সেই মুহূর্তে বাবানরা গ্রাম ছেড়ে হুগলি চলে গেলো। ব্যাস, শুধু পড়ে রইলো কিছু না পাওয়া সোহাগ, প্রেম ও তৃপ্তি। কিন্তু বাবানের বাজানো ভায়োলিন এর সুর যে ময়ূরাক্ষীর উত্তাল স্রোতে অবিরল তিয়াসার অভিমানী মুখচন্দ্রিমার গোলকধাঁধাময় নকশা আঁকছিল তাতে কোন সন্ধেহ নেই।

ভট্টিকাব্যে শরৎ ঋতুর সৌন্দর্য্য

পায়েল পাত্র
সংস্কৃত বিভাগ (ষষ্ঠ সেমিষ্টার)

সংস্কৃত সাহিত্যে বহু সুপণ্ডিত কবিদের দ্বারা বিরচিত নানা ছন্দে, নানা কৌশলে, নানা বৈচিত্র্যময়, কত কিছুর মাধ্যমে সেইসব প্রাচীন যুগকে ঘিরে আজও আমরা কত প্রাচীন যুগের বহু কবিদের দ্বারা লিখে যাওয়া কত সুন্দর সুন্দর মহিমাপূর্ণ নাটক, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গদ্য, পদ্য, চম্পূকাব্য, ইত্যাদি রচনাগুলির মাধ্যমে আমাদের আধুনিকযুগকে নতুনভাবে অস্তিত্বের দান করেছে। ঠিক এমনভাবেই সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে এক অন্যতম সর্বোপরি কবি হলেন আমাদের ভট্টিকবি। তিনি নিজের নামের মাধ্যমে ভট্টিকাব্যের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। ফলস্বরূপ, আমাদের বাংলা বৈচিত্র্যে বয়ে চলা ছয়টি প্রধান ঋতুচক্রের সাথে থাকা শরৎ ঋতুর সৌন্দর্য্যের মহিমা যে কত সুন্দরভাবে রামচন্দ্রের মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয় তা আমরা শিক্ষার্থী হিসেবে জানতে পারার সুযোগ পাই। যেখানে বৈদিক শাস্ত্রানুযায়ী মুনি, ঋষিরা কোনো এক বৃক্ষের তলায় শিষ্যদের যখন ব্যাকরণের পাঠদান করছিলেন তখন হঠাৎ করে একটি হাতি যদি সামনে পেরিয়ে যেতো তাহলে সেদিন থেকে শুরু করে প্রায় এক বছরের মতো ব্যাকরণের অধ্যায়ন বন্ধ থাকতো ফলে আর শিষ্যদেরকে ব্যাকরণ পড়ানো হতো না। পাণিনীয়ের মতে ব্যাকরণ যদি শুদ্ধভাবে জ্ঞান না থাকে তবে সংস্কৃত সাহিত্যের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায় ফলে শুদ্ধভাবে কোনো বিষয়ে রচনা করা অসাধ্য হতে বাধ্য।

তাই ভট্টি স্বয়ং তাঁর রচিত ভট্টিকাব্যের মাধ্যমে ব্যাকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়, তাই কাব্যের মাধ্যমে ব্যাকরণের শিক্ষা।

ভট্টিকাব্যের মূল উপজীব্য বিষয় হলো মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ মহাকাব্য।ভট্টিকাব্যে মোট বাইশটি সর্গবিশিষ্ট আর এইগুলো প্রধান চারটি কাণ্ডে বিভক্তযুক্ত। ভট্টিকাব্যের বাইশটা সর্গের মধ্যে দ্বিতীয় সর্গের নাম 'সীতাপরিণয়' আর এই দ্বিতীয় সর্গের মূল বিষয়বস্তু হলো শরৎ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য। তাই কবি প্রথমে বলেছেন যে,

" বনস্পতিনাং সরসাং নদীনাং
তেজস্বিনাং কান্তিভৃতাং দিশাসচ।
নির্যায় অস্যাঃ স পুনঃ সমন্তাৎ
শ্রীযং দধানাং শরদং দদর্শ "।।

যেখানে রামচন্দ্র অযোধ্যা থেকে বেরিয়ে শরৎ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পরিবেশে নিজেকে যেনো আনন্দের অনুভূতির সাথে বললেন চারিদিকে বৃক্ষ, সরোবর, নদী, চন্দ্র, তারকাদি এবং নির্মল দিক সমূহের শোভায় শোভমানা শরৎ লক্ষ্মীকে দেখতে রইলেন। রামচন্দ্র শরতের এইরকম একটা আনন্দময় প্রকৃতিকে দেখে বুঝতে পারলেন নদী, সরোবর, প্রভৃতি তীরগুলো জলে প্রতবিম্বিত তীরস্থ বনগুলিকে দেখে তার নিজের সৌন্দর্য্য যেনো অপহরণ করে নিয়েছে, তাই তিনি বললেন,

" বিম্বাগতৈ স্তীরবনৈঃ সমৃদ্ধিং
নিজাং বিলোক্যাপহৃতাং পয়োভিঃ।
কূলানি সামর্ষতয়েব তেনুঃ
সরোজলক্ষ্মীং স্থলপদ্মহাসৈঃ"।।

ভট্টিকাব্যে এমন আরেক ধরণের শ্লোকের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে মধুর মিলনের সঙ্গীত যেনো কানে প্রবাহিত হয়, তা হলো--

" न तज्जलं यत् न सुचारुपंकजं
न पंकजं तद्यदलीनषटपदम्।
न षद्वद असौ न जुगुंज यःकलं
न गुंजितं तत् न जहार यत्मनः"।।

শরৎ প্রকৃতির উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, এমন কোনো জল থাকেনি, যেখানে সুন্দর কোনো পদ্ম ফোটেনি, এমন কোনো পদ্ম ফোটেনি যেখানে ভ্রমরের গুঞ্জন শোনা যায়নি, আর এমন কোনো ভ্রমর দেখা যায়নি, যেখানে ভ্রমণের মধুর গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়নি।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভট্টিকবি সত্যিই সংস্কৃত জগতে কোনো অংশেই অল্প স্থানে বিস্তারিত নয়, তিনি সমস্ত সংস্কৃতপ্রেমী মানুষের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছেন।

* রেফারেন্স বই - রত্না দত্ত,

** রেফারেন্স বই - শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

অন্তরালে

এষা বরাট
কেমিষ্ট্রি বিভাগ (ষষ্ট সেমিষ্টার)

রাস্তার মোড়ে হঠাৎ একদিন তার দেখা মিলল। বেশ কিছুক্ষণ সেই চশমা পরা কাঁচা-পাকা চুলের ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সমীরণ ভাবে............ ....মৈনাক না! ছুটে গিয়ে সেই চশমা পরা ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে "কি রে, কেমন আছিস?" মৈনাক আপ্লুত স্বরে সমীরণের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলে "আমি বেশ আছি, তুই কেমন আছিস?" উত্তরে আমি বলে উঠি "ভালো আছি আমি, তোর সঙ্গে অনেক বছর পর দেখা হল আমার, সেই বহু বছর আগে উচ্চমাধ্যমিকের আগে কোনো একদিন দেখা হয়েছিল আমাদের। আমার কথা শুনে মৈনাক মৃদু হেসে বলে ওঠে হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস।" তারপর বেশ কিছুক্ষণ এটা-ওটা কথা বলার পর হটাৎ অন্যমনস্ক হয়ে বলে উঠল "আজ আসি রে, আবার অন্য কোনো দিন দেখা হবে।" এই বলে রাস্তার মোড় থেকে এগিয়ে যেতে লাগল, নদী পাড়ের রাস্তাটার দিকে।

ইস্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। কত গল্পই না করেছি একসঙ্গে। ক্লাসে মৈনাক বরাবরই মাঝারি গোছের ছাত্র ছিল কিন্তু খুব অদ্ভুতভাবেই আমাদের প্রথম সারির সকল ছাত্রদের সঙ্গে মৈনাকের খুব সুন্দর একটা বন্ধুত্ব ছিল। ক্লাসে মাঝে মধ্যে দেরি করে এলে মৈনাক সবার শেষ বেঞ্চটায় বসত আর ক্লাসের স্যার চলে গেলে মাঝে মধ্যেই আমাদের প্রথম বেঞ্চে এসে এটা - ওটা কত কথাই না বলত, আমাদেরও বেশ লাগত ওর সঙ্গে গল্প করতে, মনে হত ওর সাথে আমাদের কোথাও যেন একটা আত্মীক যোগ আছে। টিফিনের ঘণ্টা পরলে আমরা সকলে মিলে মাঠের ধারের ঐ বড় বটগাছটার নীচে বসতাম। মাঝে মধ্যে আমি, অপূর্ব, অনিকেত, সৌরভ সকলে মিলে মৈনাককে জোর করতাম গান শোনানোর জন্য। মৈনাকও আপত্তি না করে আমাদের গান শোনাত প্রত্যেকবার, কি সুন্দর গানের গলা ছিল ছেলেটার। আজও মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা। আমাদের স্কুলের রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে প্রত্যেক বছরই গান করত মৈনাক আর আমরা সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম মৈনাকের গান শুনব বলে। পুরনো কথা ভাবলে মনটা ভারী নস্টালজিক হয়ে ওঠে।

উচ্চমাধ্যমিকের পর আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের ভবিষ্যতের আকাশে পাড়ি দি। সৌভাগ্যক্রমে আমার আর অনিকেতের সাত বছরের আস্তানা হয়ে ওঠে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। অপরদিকে অপূর্ব আর সৌরভ হয়ে ওঠে পদার্থবিদ্যার ছাত্র।

ছকের সকল বাঁধা ধরা নিয়মের অতীত ছিল আমাদের মৈনাক, স্কুলের অফ পিরিয়ডে জানালা দিয়ে কেমন অদ্ভূতভাবে তাকিয়ে থাকত আর খাতার শেষ পাতায় এটা-ওটা কিসব যেন লিখত, মাঝে-মধ্যে আমরা গিয়ে বলতাম 'কিরে মৈনাক, কি এতো ভাবিস সারাদিন?' উত্তরে মৈনাক খালি মৃদু ভাবে হাসত।

কিন্তু বছর যেতে না যেতে মৈনাকের জীবনটা কেমন যেন পাল্টে গেল, আমাদের প্রাণোচ্ছল মৈনাকের দীপ্তি কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। ক্লাসে দেরি করে আসত, আমাদের সঙ্গে খুব একটা কথাও বলত না। সারাদিন কেমন আনমনে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকত।

আজ আমরা সকলেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত। আমি আর অনিকেত প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, অপরদিকে অপূর্ব এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক. আর সৌরভ, সে তো এখন বিদেশে থাকে । মাঝে-মধ্যে দেখা হয় আমাদের, কত কী না কথা হয় আমাদের মধ্যে । মৈনাকের কথা মাঝে-মধ্যেই আমাদের সকলের মনে পড়ত, অপূর্বর কাছ থেকে জানতে পারি তার এখন একটা গানের স্কুল আছে । মৈনাকের কথা ভাবলেই আমাদের মনটা বড়ই বিষাদগ্রস্ত হয়ে উঠত ।

মৈনাকের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমরা সকলে মিলে ওর বাড়ি যাব ঠিক করি, আর্থিক অনটনে বিপর্যস্ত

নিজের সকল অপূর্ণ স্বপ্নকে বয়ে নিয়ে বেড়ানো সেই মৈনাক যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ঠান্ডা বাতাসের মতো একটু শান্তি নিয়ে আসত ।

আমরা সকলে মিলে একদিন মৈনাকের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে মৈনাকের দেখা মিলল না। জানতে পারলাম আমাদের খোলা খাতার মতো মৈনাক নিরুদ্দেশ ...!

আমার কলেজ জীবনে প্রথম পুরীভ্রমণের অভিজ্ঞতা

পায়েল পাত্র

সংস্কৃত বিভাগ (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

সূচনা:- শৈশবকাল শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত একটা ইচ্ছে ছিল যে নিজের পরিবার তথা আমার মা,বাবা,ভাই, বোন, ঠাকুমা গোটা সপরিবারকে নিয়ে পুরীর মতো এক পবিত্র স্থানে আমরা সবাই মিলে ভক্তরূপে শ্রী জগন্নাথদেবের দর্শনলাভ করবো। যেহেতু যখন আমাদের কলেজে ছয়মাস অন্তর সেমিস্টারের মাধ্যমে যখন পরীক্ষাগুলো শুরু হয় তখন আমি একা যাইনি, আমি আমার ভবিষ্যতের দুই পথপ্রদর্শক তথা আমার প্রাণের চাইতেও সবথেকে বেশি কিছু যারা আমার জন্মদাত্রী এবং আমার জন্মদাতা, তাঁদেরকেই নিয়ে আমার অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষ্যত জীবনে অতিবাহিত আমার ইচ্ছাশক্তির চাবিকাঠি। যারা ছাড়া আমি দুই চোখে সর্বদাই অন্ধ দেখি, তাঁরাই আমার পথের আলোজ্জলমাত্র। তাই যখন গাড়িতে আমরা তিনজন মিলে যাই তখন মায়ের সাংসারিক কর্মের জন্য একটু দেরি হলেই আমার মা কেবল জগন্নাথদেবের নাম উচ্চারণ করতো আরতখন পরীক্ষা সেন্টারে যেতে দেরি হলেও পরীক্ষা চলাকালীন আমার কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না, যেহেতু আমার মা গোটা রাস্তায় জগতের নাথ শ্রী জগন্নাথদেবের নাম উচ্চারণ করেছিল। আর এইভাবে আমাদের তৃতীয় বর্ষের পঞ্চম সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের ষষ্ঠ সেমিস্টারের আগমন শুরুতেই আমার পুরী ভ্রমণ করার সুযোগটা আসে।

যাত্রা:- আমাদের এই পুরী ভ্রমণটা শুরু হয়, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যাপীঠের সংস্কৃত বিভাগের একজন ছাত্রী হিসেবে। আমাদের বিভাগীয় প্রিয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের সহযোগিতার কারণে সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখে আমাদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বর্ষের সমস্ত ছাত্রীদের এবং আমাদের বিভাগীয় অধ্যাপক, অধ্যাপিকাগণ মিলে একটা আলোচনাসভা ঠিক করা হয়, যেখানে পুরী ভ্রমণ বিষয়ে কিছু তথ্যের আলোচনা করা হবে। তারপর আলোচনার সমাপ্ত পর্বে জানা যায় যে আগামী মাসের ৭ই মার্চ, শুক্রবারে পুরীর উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করবো। এটা শোনার পরেই সবাই নিজের সামর্থ্যানুযায়ী কেনাকাটার পরিকল্পনা শুরু করে যেহেতু হাতে মাত্র সময় ছিল ২০-২৫ দিন। তাই কেউ কেউ বাঁকুড়ার স্টাইল বাজার, শ্রীলেদার্স, আর আমাদের কলেজের গেটের বামপাশে অবস্থিত কলকাতার বিগবাজার, ইত্যাদি কত নতুন নতুন দোকানে শপিং করি। মা,বাবা তো আমার জন্য চিন্তায় ছিল এবার কিছু কিনে দিতে হবে যেহেতু আমি বর্তমানে কলেজ জীবনের একেবারেই শেষের মুখে তাই বাবা, মা টাকা ধার করে আমাকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দোকান থেকে খুব তাড়াতাড়ি এনে দেয়, আর আমি তাতেই আনন্দে পরিপূর্ণ। এইভাবে যাত্রার জন্য দিনগোনা শুরু হয়েছিল জীবনে প্রথমবার।

পুরী ভ্রমণে যারা ছিলাম:- এই ভ্রমণে পাড়ি দেওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে যারা ছিলেন তাঁরা হলেন আমাদের সংস্কৃত বিভাগে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক দেবব্রত স্যার, ফাল্গুনী স্যার, অমিত স্যার, প্রিয়া ম্যাম, অসিত স্যার আর এবারে এই ভ্রমণে উপস্থিত ছিলেন আমাদের দর্শন বিভাগে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা সানুশ্রী ম্যাম। আর আমরা তথা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীরা এবং যারা ২-৩ জন রাঁধুনি কাকু ছিলেন তারা আবার বাস চালক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।

যাত্রার প্রথম দিন ও শেষদিন :- আমাদের এই ভ্রমণ যাওয়া আসা নিয়ে মোট ছয়দিনের ছিল তথা ৭ই মার্চ থেকে ১২ই মার্চ পর্যন্ত। আর ৭ই মার্চ শুক্রবার বিকাল ৪:৩০মিনিটে আমাদের কলেজ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে জগজ্জননী মা সারদামণির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে স্যার,ম্যাম এবং আমরা সবাই মিলে জয় জগন্নাথদেবের

নাম উচ্চারণ করে বাসে নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়লাম আর শুরু হয় পুরী ভ্রমণের প্রথম দিনের যাত্রা। তারপরের দিন ভোর ৫টার সময় ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হয়ে সকালে জলখাবার শেষ করে স্যার, ম্যামেদের সাথে ছাতা, ব্যাগ, জলের বোতল, টুপি আর গ্রুপ অনুযায়ী আমরা সোজা নন্দনকানন চিড়িয়াখানাতে প্রবেশ করি, ফাল্গুনী স্যার সকলের জন্য টিকিট কাটেন যাতে আমরা বিভিন্ন পশু, পাখিদের দেখার সুযোগ পাই তাই আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ টিকিট নিয়ে পশু, পাখি দেখা শুরু করি এবং অমিত স্যারের ফোনে আমরা সবাই পশু পাখিদের সাথে নিজেদের গ্রুপফটো তুলি স্মৃতির খাতায় রাখার জন্য। তারপর নন্দনকানন চিড়িয়াখানা থেকে ফিরে এসে আমাদের রাঁধুনি কাকুরা দুপুরের খাবার করে রেখেছিল আর আমরা সবাই মিলে মধ্যাহ্ন খাবার খেয়ে আমরা সেখান থেকে উদয়গিরি,খণ্ডগিরি, প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানগুলোতে যাই আর তারপর বেরিয়ে পড়ি ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ শিবমন্দিরের উদ্দেশ্যে সেখানে ফোন, ব্যাগ, জুতো ইত্যাদি জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়া নিষেধ থাকায় সেখানে ফোনে ছবি তোলা হয়নি, ফলস্বরূপ আমরা সবাই বাস থেকে নেমে স্যার, ম্যামেদের সাথে আরতির সময় প্রণাম করি যাতে জগতের কল্যাণ হয় সবসময়ের জন্য। আমরা প্রণাম করার পর আবার সোজা বেরিয়ে পড়লাম পুরী হোটেলের উদ্দেশ্যে তাই বেশি অযথা সময় নষ্ট না করে হোটেলের উদ্দেশ্যে বাসে উঠে পড়ি আর একটা ভুলবশতঃ এক আশ্রমের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হতে হয়েছিল, ওই আশ্রমটার নাম ছিল শ্রী শ্রী গৌর গোবিন্দাশ্রম, পুরী, কিন্তু আমরা হোটেলে থাকবো বলে এটা একটি সত্যিই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, যেহেতু আমরা সবাই মেয়ে ছিলাম, আর এই কারণেই আমাদের স্যার, ম্যামেরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় আর এই বিপদকে সৎ উপায়ে উদ্ধার করার জন্য আমাদের মধ্যে থাকা ফাল্গুনী স্যার ও অমিত স্যার দুজনে মিলে একটা নতুন হোটেল দেখার জন্য সেখান থেকে বেরিয়ে তার কিছুক্ষণ পর আমরা রাত ১১:৩০ নাগাদ সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে পরপর গিয়ে শ্রীভূমি এবং অশোকা নামে দুই নতুন হোটেলে থাকার জন্য উপস্থিত হই। তারপরের দিন থেকে শুরু হয় পুরী সমুদ্রে স্নানের উদ্দেশ্যে আর তারপরের দিন আমরা সবাই মিলে জগন্নাথদেবের মন্দিরে যাই স্নান করে পূজো দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিন্তু এত ভিড়ের মাঝে আমাদের একজন প্রিয় সহপাঠী আমাদের থেকে একসময় আলাদা হয়ে যায় আর পরে আমরা অনেক দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হই যেহেতু ওই সহপাঠী আমাদের মধ্যে একজন ছিল এই ভ্রমণে। তারপর জগন্নাথদেবের কৃপায় তাকে স্যার, ম্যাম এবং আমরা প্রত্যেকে ওই সহপাঠীকে খোঁজার চেষ্টা করি এবং কিছুক্ষণ পর পাওয়া যায় আর আমরা সবাই মিলে জগতের কল্যাণার্থে পূজো দিই আর বাইরে বেরিয়ে সবাই অমিত স্যারের ফোন থেকে গ্রুপফটো তুলি, আর আমাদের পূজো দেওয়ার পর আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম হোটেলের উদ্দেশ্য। পরেরদিন আমরা সবাই ১১ তারিখ, মঙ্গলবার সকাল ৭টার সময় বেরিয়ে পড়লাম বাসস্ট্যান্ডে আর সেখান থেকে আবার আমরা ধবলগিরিতে গেলাম, আর পরেরদিন তথা ১২ই মার্চ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে সারদামণি কলেজের গ্যেটের সামনে উপস্থিত হলাম।

পরিশেষে বলা যায় যে, পুরীতে যাওয়া মানে সত্যিই পূর্বজন্মের ফলস্বরূপ। আর আমার এই পুরী ভ্রমণের কাহিনী সারাজীবন মনের মণিকোঠায় থাকবে।

Women Empowerment through Education at Saradamani Mahila Mahavidyapith

Purbali kundu
Department of English (4th Semester)

She rises here
At Saradamani Mahila Mahavidyapith
A girl finds her trust,
With books and dreams hold close in hand
She learns to rise, to speak, to stand.

The power of women is no longer just a slogan – it is a rising reality. In 2025, as the society moves forward, women are becoming more vocal, confident, and strong, not just in cities but also in every corner of our country – This is exactly what Saradamani Mahila Mahavidyapith, Bankura does for hundreds of young women. It helps them rise and be proud here at this women's college committed to shaping the future leaders, thinkers and changemaker.

As a proud student of this college, I Purbali Kundu from the English department, currently in 4th Sem, 2nd year, can say that every moment spent in this institution has been a truly transformative experience for me. When I first joined this college, I came with dreams and curiosity. Today I have become stronger, braver and more determined because this college has given me not just bookish knowledge but also self-confidence, identity and voice.

As an all-girls institution, our college is deeply focused on women's growth, safety and empowerment. The environment here is extremely supportive, disciplined and inspiring. In a world where women more often then not face obstructions, this college stands like a banyan tree, offering shades and strength for those who dare to dream. A women's college in both name and spirit, Saradamani Mahila Mahavidyapith is a name where aspirations are not only nourished but also celebrated .

Dr. Anupriya Mandal, our respected head of the department, is a pillar of strength for all of us. His constant guidance and kind nature can be felt even in our smallest endeavours. Equally supportive are our other beloved teachers—Dr. Amit Bairagi Sir, whose depth of knowledge and passion for literature inspire us daily; Meghna Ma'am, whose teaching brings clarity and comfort; Riya Ma'am, always ready to encourage and uplift; Sujay Sir and Amit Sir, whose classes are filled with energy

and joy. Together, they make our department a family, where each student gets a chance to flourish.

One of the most enigmatic aspects of Saradamani Mahila Mahavidyapith is its girls' hostel. For students who come from far-off places, this hostel becomes a second home for them. More than just rooms and beds, it offers a sisterhood — a place where late-night study sessions, shared meals, and silent encouragement become a part of our growth. It builds resilience and independence — two key qualities every woman must carry into the world.

The college calendar is rich with events and cultural programmes that help us grow not only as students but also as individuals. From "Freshers' Welcomes" to "Grand Farewells", from music concerts featuring guest artists to student-led performances — we are always given a stage to express ourselves. These moments shape our confidence and creativity. One of the most cherished celebrations is Saraswati Puja — a day when our entire college comes alive with devotion, colour, and unity. Students decorate altars, offer prayers, and celebrate the goddess of knowledge with joy, marking a perfect harmony of tradition and youthful enthusiasm.

Saradamani Mahila Mahavidyapith, Bankura is a beacon of women's leadership. So many alumni from this college have gone on to become educators, administrators, writers, lawyers, and changemakers. They are living proof that when women are educated and empowered, there are no limits to what they can achieve. And we, the current students, follow in their footsteps — carving our own paths with courage and commitment . We are not Just taught to succeed in exams but to succeed in life -- to stand up ourselves .

In a world where women still face discrimination, this college stands as a fortress of strength. It teaches us that power doesn't always come from physical strength—it comes from knowledge, self-belief, and unity. As students of Saradamoni Mahila Mahavidyapith we are reminded every day that we are capable, courageous, and unstoppable.

As I close this articles, I would like to offer my heartfelt gratitude to all our professors , Anupriya sir, Meghna ma'am, Riya ma'am, Amit sir, Sujoy sir, Amit Chakraborty Sir. Thank you for shaping our lives with dedication, patience and passion. It is because of you, we talk with our head's held high, ready to write our own stories.

This college is not just an institution – it's a family. It teaches us that women power is not a slogan – it's a truth, a strength, a promise. .

To each and every professor of our college. I offer my heartfelt pronam. You are the unsung heroer of our stories. You are the roots that let us rise .

And I am proud to say : I belong to saradamani Mahila Mahavidyapith , Bankura, where women rise.

THE OCEAN'S LESSON

Susmita Dutta
English Department (2nd Semester)

It was January and Raima's family had a great chat over a cup of tea in the evening. They were talking about a winter vacation. But where? A big question for everyone. Suddenly Raima came out of the next room.

"Can you tell us which place would be the best, my girl ?" Raima's mother asked her.

Raima didn't know anything about this matter ,because she was reading a storybook in the next room.

"What happened? Where are you going? " Raima naturally asked the question because the subject was completely unknown to her.

"We're going to go somewhere this holiday. But No one can find where to go,"answered Raima's question.

"I don't know where we should go. Anyway, I have a few more pages left in the story I was reading, so I'll read that" Raima said.

"What kind of story is that? You've been reading it for a week" Raima's mother asked.

"A great sea adventure story, a very suspenseful story that makes you want to keep reading " Raima replied enthusiastically.

"What did you say? The story about the sea adventure?" Raima's mother asked, and there was a special sparkle in her eyes.

"umm.. yes," Raima said .

"Tell us first! I've found the best place to go. How will going to Digha be?" Raima's mother said.

"Of course!" The whole family agreed.

"Really? Really, I'm going to Digha? I'm going to see that sea ,the sea I've read about in storybooks? The sea I've only seen on the phone? The sea I've only heard about from people? I'm going to see Digha! Raima's face was worth seeing! Just like the joy of getting her first dream toy as a child, Today, that same joy is visible on Raima's face again.

It was natural for a girl who had never even heard the sound of the ocean. She had created a scene in her mind from afar, and today she was about to see that scene.

"Obviously. After tomorrow morning we will all leave for Digha" Raima's parents said.

"So fast! I still have so many clothes to pack," Raima said and immediately went to

her room.

Everyone in the family saw the excitement of Raima. Raima spent the next day packing her things. She lives in a different world now. She always wondered what the ocean would be like? What its waves and sounds would be like. She asked many questions to herself and also to everyone in her family before leaving . At the end of the day, she went to bed thinking about a wonderful childhood dream is going to come true tomorrow . And finally , the day to go to Digha arrived. Raima got up early in the morning and got ready. Everyone was traveling by train. The train arrived at 6:30 am. It took about 5 hours to reach Digha.

All the scenery along the way seems new to her today. Because of the excitement? Exactly! She couldn't believe how 5 hours had passed while she was laughing and joking with her family members.After a journey of 5 hours, they finally reached Digha.

And then, that time has come. The first sound that came to Raima's ears was the sound of ocean waves. Raima saw the vast ocean in front of her. The scene was more beautiful than she could have imagined. She slowly walked a few steps towards the sea. She moved closer and then? She had touched the sea water for the first time.

"Come on, we'll come back here after we've freshened up" Her mother told her.

But what about Raima? Now all she can hear is the sound of the ocean waves.

But then she realised that her mother was calling her and she went there immediately.

"Maa,is the sea so beautiful? I mean, to say it's 'beautiful' would be an understatement, It's enchanting".

"Let's freshen up and eat something and then go to see the ocean again. alright?"

Around 1 pm that afternoon, everyone headed back to the beach. Raima took the sea water in her hand and saw a different kind of glow there. Everyone is calling Raima, but she was a little afraid to break the waves and even in such a vast ocean for the first time. She held his father's hand and slowly stepped into the sea and played with the waves.

The whole day passed happily. The next day, instead of coming to the beach in the morning, Raima and her family went to the beach in the afternoon, to enjoy the beach sunset view. Suddenly Raima noticed something, an old man was sitting on the beach, talking to himself. She went a little further and saw the man selling pearl jewellery. Raima saw how many beautiful pearl necklaces there were. A necklace caught Raima's eye. So she asked the price.

"How much does this necklace cost ?" asked Raima .

"50 rupees per necklace" he answered her in a low voice.

“I’ll take this one, please pack it up” Raima purchased it.

“Come again,” the old man said with a little pleasant smile.

“This is my first visit to Digha. It’s a very beautiful place” Raima told the old man.

“It is,” the old man replied while looking at the sea.

“We have grown up from childhood just by looking at this sea. And the many things this sea has taught us are perhaps indescribable” said the old man.

“I didn’t know that the ocean teaches lessons.” Raima asked him with a curious look.

“Of course it teaches! Everything in nature teaches us something in our daily lives. We should also learn. One of them is the ocean. Look at the sea once” the old man told Raima and they both looked out to sea.

Further he said, “ This sea is so beautiful to look at. The blue color, the melodious music of the waves, the cool breeze give everyone a different kind of calm feeling. But you know what? Even in this beautiful ocean, there are many storms, but it fights alone. And when the sun rises again the next day, the ocean seems to take on a new form, even more beautiful than before. It seems as if the sea is shining like crystals. Similarly, human life is full of struggle. We have to fight and when the sun rises on the next day, our life will also become bright like this ocean. Then we will think that we had to struggle for this brilliance.Nothing is achieved without struggle.Look at us! I have been here for many years selling this pearl necklace. This is how I support my family, raising my son and daughter. However, the day may not be bright one day, but it will be ‘ONE day’.And we must continue to struggle for that ‘ONE day’.”

Raima was listening carefully to the old man’s words . She was thinking those words when she heard her father’s voice calling her. She said one thing to the old man, “This sea has taught me a lot too,” and then went back to her family.

Then they came home. The vacation was truly wonderful for everyone, especially Raima. Because as she saw the ocean, the ocean taught her many things, and the lessons she learned will stay with Raima for a long time.

BANKURA ZILLA SARADAMANI MAHILA MAHAVIDYAPITH

GB Member :—

Mr. Arup Chakraborty	President
Dr Anurupa Mukhopadhyay	Teacher-in-Charge/ Secretary
Sri Bishnu Bajoria	Donor Member
Sri Goutam Kumar Das	Government Nominee
Dr Shyamal Santra	Government Nominee
Dr. Rinku Bandyopadhyay	University Representative
Dr Jaidul Islam	University Representative
Prof. Goutam Mandal	Bursar (Invitee)
Dr Sayantan Mondal	Teachers' Representative
Dr Anupriya Mandal	Teachers' Representative
Sri Tarini Sindal	Non-Teaching Staff Representative

Faculty Details :—

Dr Anurupa Mukhopadhyay	Associate Professor
Dr. Sanu Bhattachariya	Associate Professor
Dr. Uday Sankar Sarkar	Associate Professor
Goutam Mondal	Associate Professor
Anabik Biswas	Associate Professor
Dr Sayantan Mondal	Assistant Professor
Tumtum Mukherjee	Assistant Professor
Dr. Anupriya Mondal	Assistant Professor
Dr Amrita Majumdar	Assistant Professor
Dr. Buddhadeb Chatterjee	Assistant Professor
Dr. Priyanka Banerjee	Assistant Professor
Amit Sana	Assistant Professor
Dr. Rituparna Chattopadhyay	Assistant Professor
Dr. Haradhan Kundu	Assistant Professor
Dr Amit Bairagi	Assistant Professor
Dr. Shyamal Santra	Assistant Professor
Dr. Abira Dutta Roy	Assistant Professor
Meghna Roy	Assistant Professor
Dhananjoy Murmu	Assistant Professor
Dr. Ananda Saini	Assistant Professor

Jahangir Hossain	Assistant Professor
Dr Sharmila Tamang	Assistant Professor
Tapas Kumar Sutradhar	Assistant Professor

SACT Details :—

Anindita Mukherjee	SACT
Swagata Pati	SACT
Shilpi Baksi	SACT
Bappaditya Mukherjee	SACT
Amit Kumar Chakroborty	SACT
Riya Pal	SACT
Sujoy Patra	SACT
Dr. Falguni Mukhopadhyay	SACT
Priya Sinha	SACT
Dr Subarna Mukherjee	SACT
Haimantee Mukhopadhyay	SACT
Sneha Das	SACT
Sabitabrata Pal	SACT
Koushambi Mukhopadhyay	SACT
Anirban Goswami	SACT
Dr. Sagarika Mandal	SACT
Sanchita De	SACT
Sampa Mondal	SACT
Sudip Panda	SACT
Tutun Ghosh	SACT
Soumen Mondal	SACT
Utpal Sain	SACT
Shrabani Dey	SACT
Jewel Karmakar	SACT
Malay Pain	SACT
Soma Das	SACT
Amrita Dey	SACT
Mousumi Karmakar	SACT
Nabanita Mukhopadhyay	SACT
Sandip De	SACT
Dr. Krishna Das Modak	SACT

Ananya Mazumder	SACT
Sri. Munna Lal Tikait	SACT
Sri. Amit Kumar Pal	SACT
Shuvendu Chattaraj	SACT
Shailaja Kanta Ghatak	SACT
Ashoke Kumar Hazra	SACT
Mousumi Banerjee	SACT
Aloke Bagchi	SACT
Priyanka Mihirachariya	SACT
Puja Adhikari	SACT
Biplab Choudhury	SACT
Monaj Kumar Dey	SACT

Visiting faculty :—

Asit Sana	Visiting Faculty
Jyotsna Gorai	Visiting Faculty
Sanjukta Rauth	Visiting Faculty

OFFICE STAFF

- Sri Biplab Das, Head Clerk
- Sri Mintu Ghosh, Clerk (Contingency)
- Sri Priyatanu Mukhopadhyay, Clerk (Contingency)
- Smt. Pratima Pandey, Computer Knowing Clerk, (Contingency)
- Sri Sudipta Dutta, Computer Knowing Clerk, (Contingency)
- Sri Laxmi Kanta Dey, Computer Knowing Clerk, (Contingency)
- Sri Mrityunjoy Lokshman, Computer Knowing Clerk, (Contingency)
- Smt. Priyanka Kundu, Computer Knowing Clerk, (Contingency)
- Sri Jhantu Bhattachariya, Peon (Contingency)
- Smt. Mangala Karmakar, Peon (Contingency)
- Smt. Champa Rani Bagdi, Peon
- Sri Sandip Ruidas, Electrician (Contingency)
- Smt. Latika Malakar, Sweeper (Contingency)
- Smt. Sharmila Malakar, Sweeper (Contingency)
- Smt. Laxmi Ruidas, Sweeper (Contingency)
- Smt. Anita Ruidas, Sweeper (Contingency)
- Smt. Lachmi Dom, Sweeper (Contingency)

- Sri Abhijit Ruidas, Guard
- Sri Sudhir Chandra Tudu, Night Guard (Contractual)
- Sri Nitai Rana, Guard (Contingency)
- Sri Bapi Mal, Gardener (Contingency)
- Sri Habu Bauri, Gardner (Contingency)
- Ms Pampa Gorai, Gym Instructor (Contingency)
- Rina Debroy, Peon (Contingency)

LIBRARY STAFF

- Librarian - Sri Manik Ch. Khan (Contractual)
- Sri Pralay Das, Library Assistant (Contingency)
- Smt. Suraj Sahish, Library Bearer (Permanent)
- Sri Ujjal Dutta, Library Assistant (Contingency)

LABORATORY STAFF

- Sri Tarini Sindal, Laboratory Attendant, Department of Geography
- Sri Abhijit Pal, Laboratory Attendant, Department of Chemistry
- Sri Gurupada Layek, Lab. Attendant Deptt. of Physics
- Sri Pritam Pandey, Laboratory Attendant, Department of Geography (Contingency)
- Sri Soumen Patra, Lab. Attendant Deptt. of Chemistry (Contingency)
- Sri Gurupada Layek, Lab. Attendant Deptt. of Physics
- Sri Tarit Mukherjee, Lab. Attendant Deptt. of Physics (Contingency)

HOSTEL STAFF

- Smt. Sima Pathak, Matron (Contingency)
- Smt. Padma Ruidas, Cook (Contingency)
- Smt. Mithu Ruidas, Cleaner & Helper (Contingency)
- Smt. Lakshmi Sharma, Helper (Contingency)
- Smt. Kalyani Ruidas, Helper (Contingency)
- Smt. Malati Kumbhakar, Sweeper (Contingency)
- Sri Tapas Malakar, Sweeper (Contingency)

Shilpa Atha (Geograpy Dept.)
6th Sem.

Shilpa Atha (Geograpy Dept.)
6th Sem.

Sahali Pal
(Eng) 2nd Sem

Priyanka Dey (Geograpy Dept.)
6th Sem.

Sahali Pal
(Eng) 2nd Sem

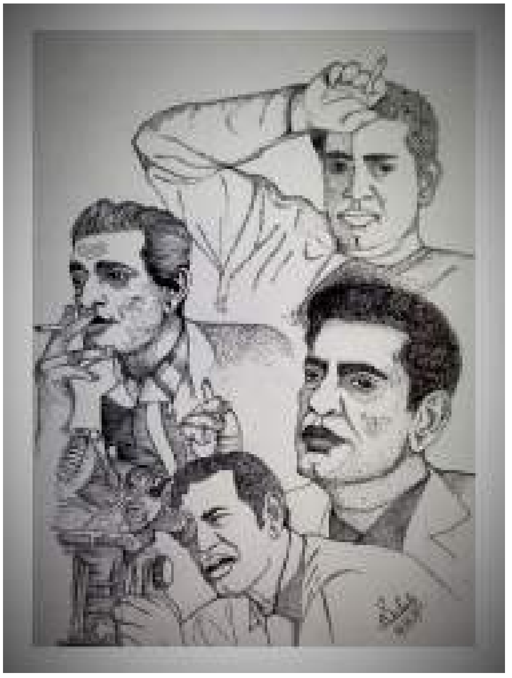

Sahali Pal
(Eng) 2nd Sem

Aditi Karmakar
(Geo Dept.) 2nd Sem.

Joyashree Mahato
(Geo Dept.) 2nd Sem.

Sneha Dey
(Eng.) 3rd Sem.

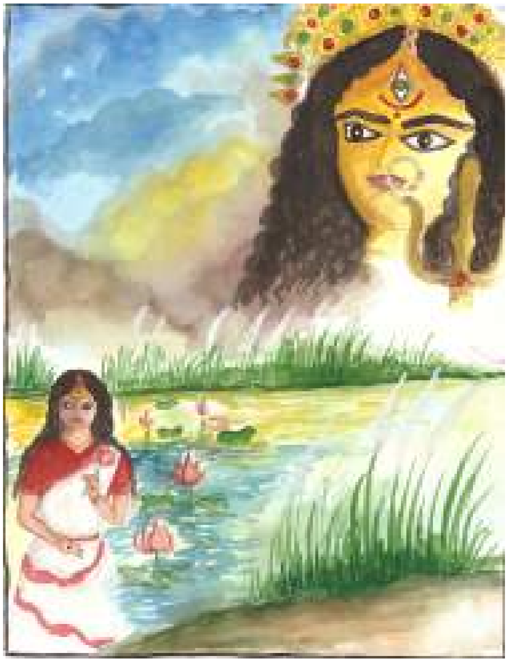

Dipanwita Shit
(Sanskrit) 5th Sem.

Srija Chowdhury
(Philosophy) 1st Sem.

Deblina Singhababu
(Philosophy) 1st Sem.

Brishti Dutta
(Eng.) 3rd. Sem.

Purba Kundu
(Eng.) 3rd. Sem.

Shreya Mandal
(Bengali) 1st Sem.

Aditi Hembram
(English) 1st Sem.

Sonali Patra
(Geography) 3rd Sem.

Sonali Patra
(Geography) 3rd Sem.

Pallabi Ruidas
(Geography) 5th Sem.

Pallabi Ruidas
(Geography) 5th Sem.

Sampa Bagdi
(English) 1st Sem.

Beuti Karmakar
(Economics) 1st Sem.

Ganga Garai
(Sanskrit) 1st Sem.

Moumita Layek
(Geography) 1st Sem.

Sunetra Mukhopadhyay
(English) 1st Sem.

Ankita Pal
(Sanskrit) 5th Sem.

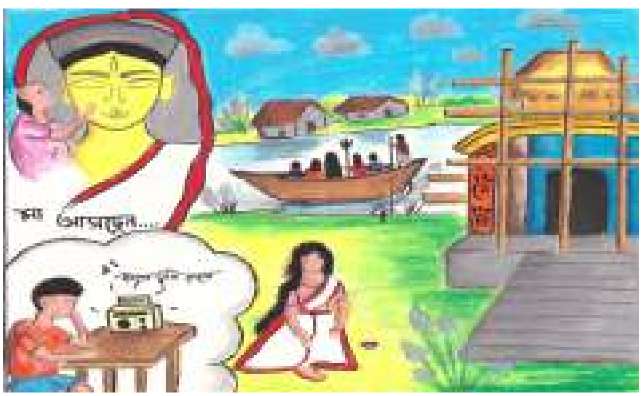

Debolina Banerjee
(English) 1st Sem.

Mandria Mahapatra
(English) 1st Sem.

Joyita Nandi (Music) 3rd Sem.

Archana Mahata (Education) 5th Sem.

Sonali Patra (M.Sc. GeographyEx Student

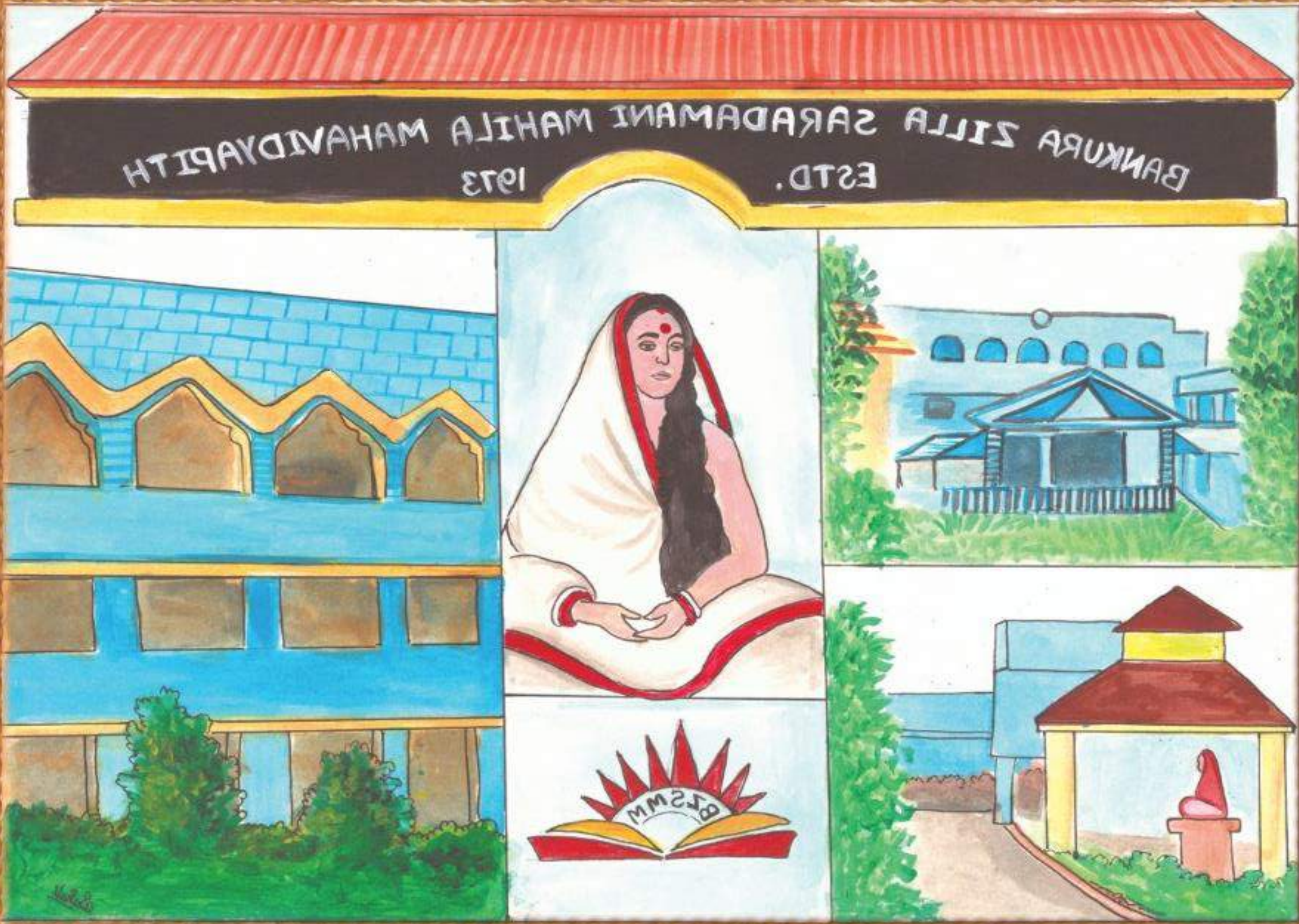
BANKURA ZILLA SARADAMANI MAHILA MAHAVIDYAPITH
ESTD. 1973
BZSMM

অঙ্কন : [illegible] পাল